চণ্ডীদাস-চরিত।



শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যাল প্রণীত।



রাজসাহী
'সমিতি' প্রেসে মুদ্রিত ও বোয়ালিয়া
'সনাতন ধর্ম্ম-সমিতি' কর্ত্তৃক প্রকাশিত



১৩১১।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

উৎসর্গ।

পরমারাধ্য

শ্রীযুক্ত বরদাগোবিন্দ সান্যাল

পিতৃদেব মহাশয়ের

শ্রীচরণে

ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-স্বরূপ

এই ক্ষুদ্রপুস্তক অর্পণ

করিলাম।

—০—

বিজ্ঞাপন।

বাঙ্‌লা প্রাচীন পুঁথি অনুসন্ধান করিবার কালে, আমি চণ্ডীদাসের কতকগুলি নূতন পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। তাহা হইতে এবং আর একখানি নামশূন্য প্রাচীন অপ্রকাশিত পুঁথি হইতে চণ্ডীদাস, তাঁহার জনক জননী ও রামমণিরাসম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য অবগত হই। এই সকল উপকরণ দ্বারা চণ্ডীদাস সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিবার বাসনা জন্মে। তাহারই ফলে চণ্ডীদাস-চরিত প্রকাশিত হইল। ইহার প্রথম পাঁচটি প্রস্তাব 'নব্যভারত' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। অবশিষ্ট কয়টী নূতন লিখিত হইয়াছে।

এই অকিঞ্চিৎকর পুস্তক প্রণয়নে আমি শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের 'বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব,' শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত 'Literature of Bengal', শ্রীযুক্ত রমণীমোহন মল্লিক সম্পাদিত 'চণ্ডীদাস' প্রভৃতি গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, তজ্জন্য তাঁহাদিগের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। 'বান্ধব', 'বঙ্গদর্শন', 'সাহিত্য', 'নবপ্রভা' প্রভৃতি মাসিক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ বিশেষেরো সাহায্য লইতে আমাকে হইয়াছে, তজ্জন্য উক্ত পত্রসম্পাদকগণের নিকটও আমি কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে আমি বোয়ালিয়া 'সনাতন ধর্ম্ম-সমিতি'র কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। তাঁহারা এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কণে বিশেষ আনুকূল্য প্রদর্শন করিয়াছেন। অলমিতি——

ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
২১ আশ্বিন, ১৩১১।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল

সূচীপত্র।

চণ্ডীদাস-চরিত।

প্রথম প্রস্তাব।

জন্ম-বৃত্তান্ত।

জগতের যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই দেখিতে পাওয়া যায়, ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া সংসার-প্রবাহ প্রবহমান, কোথাও সে ধারা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর, আবার কোথাও বা বিশাল হইতে বিশালতর। দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি অশেষ শাস্ত্র সমূহ মন্থন করিয়াও এমন কোন ধর্ম্ম আবিষ্কার করা যাইবে না, যাহা হিন্দুধর্ম্মকে পদানত করিয়া স্বগর্ব্বে মস্তকোত্তলন করিতে পারে। কপোলকল্পিত যত কেন নব মতের অভ্যুদয় হউক না, হিন্দুধর্ম্মের সহিত তুলনা করিলে তাহার সত্ত্বাই অনুভব করা কঠিন হইয়া উঠিবে। হিন্দুধর্ম্মের উপর দিয়া যত বাধা বিঘ্ন বিপত্তি বহিয়া গিয়াছে তদ্রূপ আর কোন ধর্ম্মের উপর দিয়া বহিলে এতদিন সে ধর্ম্মের নাম পর্য্যন্ত পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইত। হিন্দুধর্ম্মকে

পরাজিত করিবার অভিপ্রায়ে,—নিকৃষ্ট প্রতীয়মান করিতে কত মহাত্মা যে মস্তিষ্ক আলোড়ন করিয়াছেন, ফল তাহার কি হইয়াছে? যখন বৌদ্ধদিগের প্রবলপ্রতাপে ভারতবর্ষ প্রকম্পিত, যখন ধর্ম্মবীর বুদ্ধ 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম'-ধ্বজা উড়াইয়া ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত শিষ্য অন্বেষণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন, যখন কান্য-কুব্জ ব্যতীত ভারতের অন্যান্য প্রদেশ বুদ্ধের সু-উচ্চ পতাকা মূলে আত্ম-সমর্পণ করিতে একান্ত উৎকণ্ঠিত, তখন কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের জ্বলন্ত মহিমাচ্ছটা প্রদর্শন করতঃ বৌদ্ধ শিষ্যমণ্ডলীকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। অন্যান্য প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম অদ্যাপিও আস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারিলেও, যে ভারতবর্ষে বুদ্ধের জন্ম, সেই ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতভূমে আজ আমরা কয়জন বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীকে দেখিতে পাই? পূর্ণ-চন্দ্র-উদ্ভাসিত গগণপটে কি খদ্যোতের দ্যুতি প্রকাশ পায়? হিন্দুধর্ম্ম—কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির ত্রিবেণী।

এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব মন্দীভূত হইতে আরম্ভ হইলে, হিন্দুধর্ম্মের এক শাখা অবলম্বন কবিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম জগতে উচ্চ হইতে উচ্চতর প্রকোষ্ঠে অগ্রসর হইতে লাগিল। অবশেষে প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়া প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিলেন,—যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদত্ত হইল।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলার হিন্দু রাজত্বের লোপ হয়। এই সময় পর্য্যন্ত হিন্দু নরপতি, হিন্দু সেনাপতি,

হিন্দু মন্ত্রী, হিন্দু যোদ্ধা প্রভৃতি যাহা প্রয়োজন, তৎসমুদয় হিন্দুদ্বারা নির্ব্বাহিত হইত, হিন্দুর সমস্ত আশাই হিন্দুর দ্বারা পূরণ হইত। কিন্তু যেমনি দাসপতি বখ্তিয়ার বঙ্গে আসিয়া গ্রীবা উত্তোলন করিলেন, অমনি হিন্দুগণ শাস্ত্রদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া প্রমাণ করিলেন যে: বঙ্গে যবনাধিকার শাস্ত্রসম্মত, হিন্দুনরপতির পলায়ন স্বতঃসিদ্ধ। এই সময় হইতে বাঙ্গালী জাতি ও বাংলা সাহিত্যের উপর মুসলমানগণ যত অত্যাচার করিয়াছে, বৈষ্ণবগণ যদি তাহা ধীরতার সহিত উপেক্ষা না করিত, তবে নিশ্চয়ই বঙ্গ-সাহিত্য মুকুলেই শুষ্ক হইয়া যাইত।

বঙ্গ-সাহিত্যের প্রথমাবস্থায় কাব্যেরই প্রাদুর্ভাব ছিল। প্রথমাবস্থা বলিতে দুই এক শত বৎসর পূর্ব্বের কথা বুঝায় না, চসারের কবিত্ব-সৌরভে যখন ইংলণ্ড পুলকিত, তাহারো পূর্ব্ব হইতে বঙ্গের ক্ষুদ্রপল্লী মাণিকচাঁদ, জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতায় মুখরিত। যাঁহারা বঙ্গ-ভাষাকে নবীন সাহিত্য বলিয়া উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, তাঁহারা একটু ধীর ভাবে আলোচনা করিলেই নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন।

নিবিড় কাননাভ্যন্তরে যেমন মনাকর্ষণের একমাত্র উপাদান পুষ্প; বালক, বৃদ্ধ, যুবক যুবতী সকলেই যেমন তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে ও মধুরতায় মুগ্ধ, মানব সমাজের উপর কবিতারও তেমনি কার্য্যকারী মনোমুগ্ধকারিণী ক্ষমতা অন্তর্নিহিত আছে।

কিন্তু পুষ্প যেমন দুইদিন পরেই শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে, কবিতার তেমন শৈশব, কিশোর, বার্দ্ধক্য দশা উপস্থিত হয়না, উহা চির-নবীনা, চিরসৌন্দর্য্যে টল্‌টলায়মানা। মানব সমাজকে বিমোহিত ও বিমুগ্ধ করিবার শ্রেষ্ঠ উপকরণ—এই কবিতাসুন্দরী। যে সমাজের এই কবিতাগৌরব করিবার সৌভাগ্য ঘটিয়া উঠে নাই, সে সমাজের ন্যায় মন্দভাগ্য আর কাহার? যে কয়জন মহাত্মা এইরূপে বঙ্গীয় সমাজকে সৌভাগ্যশালী, গৌরবান্বিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে কয়েকজন গীতি কাব্যকার বৈষ্ণব কবি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য, তাঁহারাই আমাদের বরণীয় স্মরণীয় ও পূজনীয়। আমাদের অহঙ্কার করিবার আর কিছুই নাই, আছে কেবল কয়েকজন বৈষ্ণবগীতিকার। কেবল তাঁহাদের জন্যই আজ আমরা অন্যান্য প্রদেশীয়দিগের ব্যঙ্গোক্তি হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিতেছি। এই গীতি-কাব্যকারদিগের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্ববাদিসম্মত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহাদেরই একজন আজ আমার আলোচ্য।

বীরভূমির বড় সৌভাগ্য, যে সে কতকগুলি কবির জননী হইতে পারিয়াছে। কিন্তু তাহার প্রধান গৌরব, প্রেমবিহ্বল উন্মাদ চণ্ডীদাসকে বক্ষে ধারণ করিয়াছে বলিয়া। যে স্বভাব-কবির সুমধুর সংগীত-ধারা "কাণের ভিতর দিয়া মরমে" প্রবেশ করে, তিনি বীরভূম জেলার ক্ষুদ্র পল্লী নান্নুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। এই ক্ষুদ্র গ্রামের এক প্রান্তে বসিয়া প্রেমবিহ্বল চণ্ডী বঙ্গবাসীকে প্রেমতরঙ্গে ভাসাইয়া হৃদয়ে যে

প্রেমের উন্মাদকারী উচ্ছাস জাগাইয়াছিলেন, তাহার তুলনা এজগতে কোথায় ?

সিউড়ী বীরভূমের প্রায় পঁচিশ মাইল পূর্ব্বদিকে নান্নুর গ্রামে চণ্ডীদাস জন্ম গ্রহণ করেন। নান্নুর সাকুল্লীপুর থানার অন্তর্গত, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অহম্মদপুর ষ্টেশন হইতে প্রায় কুড়ি মাইল পূর্ব্বাংশে। চণ্ডীদাস যদি নান্নুরে জন্মগ্রহণ না করিতেন, তবে কয়জন সে গ্রামের নাম জানিত? তাঁহাকে লইয়াই নান্নুরের গৌরব। নান্নুরের পশ্চিমদিকস্থ এক ক্ষেত্রে হলাকর্ষণ কালে একটি পুরাতন চুল্লী পাওয়াগিয়াছিল। ইহার দ্বারা অনুমিত হয়, এক কালে ঐ স্থানে লোকের বসতি ছিল। কালের কঠোর ধ্বংস-নীতির প্রভাবে এখন তাহা জঙ্গল-প্রান্তরে পরিণত হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, বর্ত্তমান সময়ে নান্নুরের যে অংশে লোকের বসিত আছে, পূর্ব্বকালে সে অংশে নিবিড় জঙ্গল হিংস্রজন্তুর আবাসস্থান হইয়াছিল।

চণ্ডীদাস নান্নুরের বিশালাক্ষী দেবীর পুরোহিত ছিলেন, মন্দিরটী এখনো বিদ্যমান থাকিয়া অতীতের সুখ-খ্যাতি জাগাইয়া দিতেছে। মন্দিরের সম্মুখে ও দক্ষিণে অন্য কতকগুলি শিব মন্দির আছে, সে সকল মন্দির কতদিনের পুরাতন, তাহা সহজে নির্ণয় করা সুকঠিন, তবে দেখিয়া বোধ হয় যে, শতবৎসরের কম নহে। বিশালাক্ষীর মন্দির-সম্মুখস্থ শিবমন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে আরো অনেকগুলি শিবমন্দির আছে। তৎ-

পশ্চাৎ একটি উচ্চ ভূমি—ইহা একটি অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ। অনেকে বলেন, উহাই চণ্ডীদাসের আবাস বাটী। মধ্যে মধ্যে ঐ স্থান হইতে পুরাতন মোহর প্রাপ্ত হওয়া যায়। শুনিতে পাইলাম ও নান্নুরে প্রকাশ যে, ঐ ভিটা খনন কালে একটী নর-কঙ্কাল বাহির হইয়াছিল, তাহা আধুনিক খর্ব্বাকৃত মনুষ্যের কঙ্কাল নহে। প্রত্যক্ষ দর্শনকারীদিগের কথা এই যে, ঐ কঙ্কাল সপ্তহস্ত পরিমিত মানব দেহের কঙ্কাল। আমাদের বিশ্বাস, ঐ স্তূপ খনন করিলে নানা অদ্ভুত রহস্য আবিষ্কৃত হইতে পারে।

এখন চণ্ডীদাসের জন্মকাল নির্ণয় করা যাক্। বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস, নরহরিদাস, বৈষ্ণবদাস, ভক্তমাল-প্রণেতা অনেকানেক পুরাতন ও আধুনিক কবিগণের গ্রন্থে চণ্ডীদাসের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে অনুমান করা যায় যে চণ্ডীদাস শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বহুপূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ অনুমানের আর একটি কারণ এই যে, শ্রীচৈতন্যের পর যত বৈষ্ণব কবির অভ্যুদয় হইয়াছে, সকলেই নিজ নিজ গ্রন্থে ও পদাবলীতে অধিক বা কিয়ৎপরিমাণে তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের একটি পদেও মহাপ্রভুর নাম্ নাই। ১৪০৭শকে শ্রীচৈতন্য প্রভু জন্ম গ্রহণ করেন, সুতরাং তাহারো পূর্ব্বে চণ্ডীদাস জন্মিয়াছিলেন।

চণ্ডীদাস যে চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহার একটি পদ এইরূপ,——

"বিধুর নিকটে নেত্র, পক্ষ, পঞ্চ বাণ।
নবহুঁ, নবহুঁ রস হই পরিমাণ॥
পরিচয় সঙ্কেত অঙ্কে নিজ্জা।
চণ্ডীদাস রস কৌতুক কিজ্জা॥

বিধু, নেত্র, পক্ষ, পঞ্চবাণে ১৩২৫শক হয়, ইহা ১৪৩০ খৃষ্টাব্দ। যদি ১৩২৫শকে তিনি এই পদটী রচনা করিয়া থাকেন, তবে ইহারো পূর্ব্বে তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাহাই আমার নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। কারণ বিদ্যাপতি পঞ্চগৌড়েশ্বরকে কবিত্ব-সৌরভে বিমোহিত করিয়া ১৪০১ খ্রীষ্টাব্দে (১৩২০শকে) বিসপী গ্রাম প্রাপ্ত হন।* এই সময়ে চণ্ডীদাসের সহিত তাঁহার কবিতা উপহার আদান প্রদান হইত, তাহা যথা স্থানে বিবৃত করিব। এই পদটী যদি চণ্ডীদাস বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালেও লিখিয়া থাকেন, তবে ১৩০৫ শকে তাঁহার জন্ম ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। 'কবি-চরিতে' উল্লিখিত আছে যে, শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব হইবার প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যাপতি অনেক বাঙ্গলা পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি সমসাময়িক, সুতরাং ১৩০৫শকে তাঁহার জন্ম বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবেনা।

---

*পঞ্চগৌড়াধিপ শিবসিংহভুপ, কৃপা করি লউ নিজ পাশ।
বিসপী গ্রাম দান করিল মুঝে, রহতহি রাজসন্নিধান॥ বিদ্যাপতি।

চণ্ডীদাসের পদাবলী পাঠে তাঁহার জনকজননীর নাম জানা যায় না। ১২৮০ সালের ১০ই পৌষের 'সোম প্রকাশে' এক ব্যক্তি লিখিয়াছিলেন, 'চণ্ডীদাসের ১৩৩৯শকে জন্ম ও ১৩৯৯ শকে মৃত্যু হয়। ইহাঁর পিতার নাম দুর্গানাথ বাগছী, ইহাঁরা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইহাঁর রচিত গ্রন্থের নাম গীতচিন্তামণি।' লেখকের এই উক্তি সম্পূর্ণ সত্য নহে। চণ্ডীদাস যে ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা নিসংশয়রূপে প্রমাণ করা যাইবে। আমরা তাঁহার নিম্নলিখিত ভণিতাযুক্ত পদ পাইয়াছি।

(১) চণ্ডীদাস কয় ;
(২) কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস ;
(৩) বড়ু (ব্রাহ্মণ-কুমার) চণ্ডীদাস কহে।
(৪) কহে বড়ু চণ্ডীদাস।
(৫) বাসু চণ্ডীদাস ভণে।
(৬) কবি চণ্ডীদাস কহে। ইত্যাদি।

চণ্ডীদাসের নব—প্রকাশিত পদাবলীর এক স্থানে আমরা 'দাস চণ্ডীদাস' ভণিতা পাইয়াছি ;——

অদ্ভুত রীত ইহার চরিত
দাস চণ্ডীদাস জার।*

বলা বাহুল্য এ 'দাস' জাতিবাচক নহে, হীনত্ব প্রকাশক। আর একস্থলে 'দাসী' ও ব্যবহৃত হইয়াছে।

*সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

১৩৩৯শকের পূর্ব্বে যে চণ্ডীদাস জন্মিয়াছিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। তাঁহার পিতার নাম দুর্গানাথ বাগ্‌চী ছিল কি না, তাহা বিশ্বাস করিবার কোনো উপায় নাই। তবে তাঁহার নকুল নামে এক সহোদর ছিলেন। চণ্ডীদাস স্বীয় পদাবলীতে তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। রজকিনীর প্রেম-পাথারে চণ্ডীদাস নিমগ্ন হইলে, যখন তাঁহাকে জাতিতে আটক করিল, তখন নকুল তাঁহাকে রজকিনীর প্রেমত্যাগ করিতে বিশেষ অনুরোধ করেন।

আমি ১৩৭০শকের লিখিত একখানি প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছি। তাহাতে একস্থলে পাওয়া যায়, "ভবানী চরণ নামক এক ব্রাহ্মণের ঊরসে ভৈরবী নাম্নী এক কামিনীর গর্ভে চণ্ডীদাসের জন্ম হয়।" বীরভূমিস্থ জনৈক বন্ধু লিখিয়াছেন, 'নান্নুরে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, চণ্ডীদাসের পিতার নাম ভবানী চরণ রায়, ও জননীর নাম ভৈরবী সুন্দরী ছিল। খুব সম্ভবতঃ তাঁহার জন্ম ১৩০৮—১৫শকের মধ্যে হইয়াছিল।" পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন পুঁথির সহিত বন্ধুবরের কথা ঐক্য হওয়ায় আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে, চণ্ডীদাসের জনক জননীর নাম ভবানীচরণ ও ভৈরবী সুন্দরীই ছিল। পাঠকগণ একথা কতদূর বিশ্বাস করিবেন, জানি না। সাল দেখিয়া এই পুঁথি খানি চণ্ডীদাসের জীবন কালেই লিখিত হইয়াছে জানা যায়।

চণ্ডীদাসের পিতা বিশালাক্ষী দেবীর পূজক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর চণ্ডীদাস নিজে বাশুলী দেবীর পুরোহিত নিযুক্ত হন ;——

নান্নুরের মাঠে পত্রের কুটির
নিরজন স্থান অতি।
বাশুলী আদেশে চণ্ডীদাস তথা
ভজন করয়ে নিতি॥

নান্নুরের মাঠে নিৰ্জ্জন পত্র কুটীরে থাকিয়া চণ্ডীদাস ভজন সাধন করিতেন। চণ্ডীদাসের পদাবলীতে বহু স্থানে বাশুলী দেবীর নাম পাওয়া যায়।

কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলীর বরে।
ছট্‌ ফট্‌ করে প্রাণ বধু নাহি ঘরে॥

বাশুলীবরে চণ্ডীদাস পদাবলী লিখিতে আরম্ভ করেন। এই বাশুলীর বরদান প্রসঙ্গ এস্থানে উল্লেখ করিলে বোধ হয় অপ্রাসাঙ্গিক হইবেনা। বিশালাক্ষীর অপভ্রংশ বাশুলী।

বাঁকুড়া জেলার অন্তঃপাতী শালতোড়া গ্রামে নিত্যা নাম্নী বনদেবীর বাশুলী নাম্নী এক ডাকিনী সহচরী ছিল। বন-দেবীর ঝুমুর গানের প্রতি অতিশয় অনুরাগ ছিল। একদা তিনি ঝুমুর শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া সহচরীর প্রতি অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন যে, যাহাতে সহজ ভজন দ্বারা রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গীত সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়, তাহার উপায় বিধান কর। বাশুলী দেবী-আজ্ঞা প্রাপ্তে নান্নুর গ্রামে যাইয়া, নিৰ্জ্জন গৃহে চণ্ডীদাসকে নিদ্রিত দেখিয়া তাহার পৃষ্ঠে 'চাপড়' মারেন। এই আঘাতে

তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইলে, বাশুলী তাঁহাকে গুরুর আশ্রয়ে রাধা-কৃষ্ণ-লীলা সংগীতে প্রকাশ করিতে উপদেশ দেন।

শালতোড়া গ্রাম,   অতি পিঠস্থান
নিত্যের আলয় যথা।
ডাকিনী বাশুলী,   নিত্য সহচরী
বসতি করয়ে তথা॥
চণ্ডীদাস কহে,   সে এক বাশুলী
প্রেম প্রচারের গুরু।
তাঁহারি চাপড়ে,   নিদ্রা ভাঙ্গল
পীরিতি হইল সুরু॥

*   *   *

নিত্যের আদেশে,   বাশুলী চলিল
সহজ জানাবার তরে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে,   নান্নুর গ্রামেতে
প্রবেশ যাইয়া করে॥
বাশুলী আসিয়া,   চাপড় মারিয়া
চণ্ডীদাসে কিছু কয়।
সহজ ভজন,   করহ যাজন
ইহা ছাড়া কিছু নয়॥
ছাড়ি জপ তপ,   করহ আরোপ
একতা করিয়া মনে।
যাহা কহি আমি,   তাহা শুন তুমি
শুনহ চৌষট্টি সনে॥

বাশুলী বলিলেন, বিশেষ সতর্কতার সহিত মধুর রসের উপাসনা কর; কখনো দক্ষিণ দেশে যাইওনা, গেলে বিপদে

পড়িবে। ব্রজ ভাবানুসারে ভজনই শ্রেষ্ঠ, তুমি সেইরূপ ভজন কর, রামিণী নাম্নী রজকিনী তোমারি হইবে।

বস্তুতে গ্রহেতে, করিয়া একত্রে, ভজহ তাহারে নিতি।
বাণের সহিতে, সদাই যুজিতে, সহজের এই রীতি॥
দক্ষিণ দেশেতে, না যাবে কদাচিত, যাইলে প্রমাদ হবে।
এই কথা মনে, ভাব রাত্রি দিনে, আনন্দে থাকিবে তবে॥
রতি পরকিয়া, যাহারে কহিয়া, সেই সে আরোপ সার।
ভজন তোমারি, রজক ঝিয়ারি, রামিনী নাম যাহার॥

(বাশুলীর উপদেশ শ্রবণে চণ্ডীদাস আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, রজকিনীকে আমার করিলে আমি কোন্ 'বরণ' (বর্ণ) হইব ও কোন্ বৃন্দাবনে যাইব? সে বৃন্দাবন কোথায় এবং তথাকার কিশোর কিশোরীই বা কোথায়?

প্রবর্ত্ত দেহের সাধনা করিলে কোন্ বরণ হব।
কোন্ কর্ম্ম যাজন করিলে কোন্ বৃন্দাবনে যাব॥
নব বৃন্দাবনে নব নাম চয় সকল আনন্দময়।
কোন্ বৃন্দাবনে ঈশ্বর মানুষে মিলিত হইয়া রয়॥
কোন্ বৃন্দাবনে বিরজা বিলাসে তরুলতা চারি পাশে।
কোন্ বৃন্দাবনে কিশোরা কিশোরী শ্রীরূপ মঞ্জুরী সাথে॥
কোন্ বৃন্দাবনে রস উপজয়ে সুধার জনম তায়।
কোন্ বৃন্দাবনে বিকশিত পদ্ম ভ্রমরা পশিছে তায়॥
গোপতের পথ না হয় বেকত রসিক জনার সনে।
উপাসনা ভেদ যাহার হয়েছে সেই সে মরম জানে॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস না জানিয়ে তত্ত্ব কেমনে হইবে পার।
উত্তম কুলেতে লভিয়ে জনম ছিঃ নীচ সহ ব্যবহার॥

ছি:-ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া নীচের সহিত প্রবর্ত্ত হইব? বাশুলী উত্তর করিলেন,——

বাশুলী কহিছে শুনহ দ্বিজ।
কহিব তোমারে সাধন বীজ॥
প্রথম দুয়ারে মদের গতি।
দ্বিতীয় দুয়ারে আসক স্থিতি॥
তৃতীয় দুয়ারে কন্দর্প রয়।
কন্দর্প রূপেতে শ্রীকৃষ্ণ কয়॥
আসক রূপেতে শ্রীরাধা কই।
মদরূপ ধরি আমি সে হই॥
সাতাশী আখরে সাধিবে তিনে।
একত্র করিয়া আপন মনে॥
রতির আকৃতি আসকে রয়।
রসের আকৃতি কন্দর্প হয়॥
তিনটী আখরে রতিকে যজি।
পঞ্চম আখরে বাণকে ভজি॥
দ্বিতীয় আসকে সামান্যা রতি।
তবে সে পাইবে বিশেষ স্থিতি॥
চতুর্থ আখরে সামান্যা রস।
তাহাতে কিশোর কিশোরী বশ॥
বাশুলী কহয়ে এই সে সার।
এ রস বেদান্ত সমুদ্র পার॥

এই কথা শুনিয়া চণ্ডীদাস মূর্চ্ছিত হইলে বাশুলী অন্তর্দ্ধান হইলেন।

চণ্ডীদাস প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলা।
বাশুলী চলিয়া নিত্যেতে গেলা॥

মূর্চ্ছাভঙ্গের পর চণ্ডীদাসের মন অতিশয় চঞ্চল হইল। উত্তম কুলেতে জন্মিয়া নীচের সহিত ব্যবহার করিতে হইবে, কে-ই বা তাঁহাকে সাধন শিক্ষা দিবে, এইরূপ ভাবনায় তাঁহার চিত্ত অতিশয় ব্যাকুল হইল। এমন সময় নান্নুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিশালাক্ষী তাঁহাকে রামীর সহিত 'রাধাকৃষ্ণ' মহা-মন্ত্র দান করিলেন এবং তাঁহাদের শিক্ষারভার নিজেই গ্রহণ করিলেন। চণ্ডীদাস ও রামীর প্রেমের কথা আমরা পরে বলিতে চেষ্টা করিব।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, চণ্ডীদাসের পিতা বিশালাক্ষী দেবীর পূজক ছিলেন। দেবীর প্রসাদে পুত্র দীর্ঘায়ু ও খ্যাতি সম্পন্ন হইবে, এই ভাবিয়া তিনি বোধ হয় পুত্রের নাম চণ্ডীদাস রাখেন। চণ্ডীদাসও নামের সার্থকতা রাখিতে পারিয়াছিলেন, তিনি সর্ব্বাংশে চণ্ডীরই দাস ছিলেন। প্রত্যহ স্বহস্তে পুষ্প চয়ন করিয়া সভক্তি চিত্তে বিশ্বপালনী চণ্ডীর পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিতেন। এখনো এই দেবী-মন্দির বিদ্যমান আছে, কেবল নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া বাশুলীতে পরিণত হইয়াছে। দেবী প্রস্তরময়ী-চতুর্ভুজা, মহাদেবের বক্ষোপরি সংস্থাপিতা। পূর্ব্বে তান্ত্রিক মতে তাঁহার পূজা ভোগাদি সম্পন্ন হইত, কিন্তু এখন মৎস্য ও ছাগশিশু ভিন্ন আর কোন তান্ত্রিক ভোগাদির আয়োজন হয় না।* চণ্ডীদাসের স্মৃতি রক্ষার্থে এখন বেলাই গ্রামে চণ্ডীর মেলা হইয়া থাকে।

---

* বাশুলীর মদ্যমাংস ভোগের কথা প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—'বাশুলী পূজয়ে কেহো নানা উপহারে।
মদ্যমাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে॥' চৈতন্য ভাগবত।

চণ্ডীদাস অতি শৈশবে পিতৃ মাতৃ হীন হন, কাযেই বিদ্যাভ্যাস করিবার তাদৃশ সুবিধা ঘটিয়া উঠে নাই। বাল্যকাল হইতে সংগীতের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। যেখানে গানের নাম শুনিতেন, সেই খানেই আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া গমন করিতেন।

'সকল ছাড়িল যাহার তরে।
তাহারে ছাড়িতে সাহস করে॥
আদি চণ্ডীদাস চারি সুবুলান।
দাউ উঠাইল যেমন মান॥'

ইহার দ্বারা জানা যায় যে, চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণ লীলার আদি প্রণেতা। তিনি নিজেও একজন সুগায়ক ছিলেন, তাঁহার সুমধুর কণ্ঠধ্বনিতে পশু পক্ষীও স্তম্ভিত হইত।

'এই সে বাঁশীতে সঙ্কেত নিসান বাজই রসিক রায়।
তবু না ভাঙ্গিল মান অভিমান চণ্ডীদাস পুঃন গায়॥'

বাল্যকালে চণ্ডীদাসের আর একটি দ্রব্যের প্রতি বিশেষ আসক্তি ছিল। তামাক তাঁহার অতি প্রিয় ছিল এবং এই জন্য তিনি গ্রামবাসীগণের নিকট হইতে 'চণ্ডে মাতাল' উপাধি পাইয়াছিলেন।

পিতৃ মাতৃ বিয়োগে চণ্ডীদাস ঘোর দুঃখে পতিত হন, আহারের কোন সংস্থানই নাই। যে সুশীতল সুমধুর বায়ু হিল্লোল তিনি মঙ্গলময় বিধাতার আশীর্ব্বাদ-ধারা বলিয়া মনে করিতেন, তাহাই এখন তাঁহার নিকট তীব্র অভিশাপের জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু বেশীদিন

তাঁহাকে এই ভাবে থাকিতে হইল না, সহৃদয় গ্রামবাসী ভাবী কবির মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক গলদেশে যজ্ঞোপবীত দিয়া তাঁহাকে বিশালাক্ষীর পূজক করিয়া দিলেন। চণ্ডীর অন্ন কষ্ট নিবারণ হইল।

চণ্ডীদাস নান্নুরের নির্জ্জন মাঠে পর্ণকুটীরে থাকিয়া ভজন সাধন করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ একদিন তাঁহার জীবন-স্রোত গতি অবলম্বন করিবার সুযোগ পাইল। রামি (রামমণি) নাম্নী এক দুঃখিনী রজকিনী কন্যা নিতান্ত অসহায় হইয়া চারিটী অন্নের আশায় বিশালাক্ষীর মন্দিরে চণ্ডীদাসের নিকট উপনীতা হইল। রামমণির বয়স অল্প, রূপও না ছিল তাহা নহে; বিশেষতঃ তাহার কার্য্যে একটু পবিত্রতার গন্ধ পাইয়া গ্রামবাসীগণ তাহাকে মন্দির মার্জ্জন কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। তথায় থাকিয়া দেবীর প্রসাদান্ন খাইয়া রামমণি দিনদিন 'শশী-কলার' ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মন্দিরের কার্য্য সে বিশেষ নিপুণতা দেখাইতে লাগিল, কাযেই সকলে তাহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে লাগিল।

'অল্প বয়সে, দুঃখিনী রামিনী
সেবাতে নিযুক্ত হল।
চণ্ডীদাস কহে, শশীকলার ন্যায়
ক্রমে বাড়িতে লাগিল॥

* * *

রামিনী কামিনী, কাজেতে নিপুণা
সকলের প্রিয়তমা॥'

রামমণি এস্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল এবং চণ্ডীদাসেরও 'পীরিতি হইল সুরু।'

রামমণির নাম লইয়া একটু মতভেদ দৃষ্টিগোচর হয়। কেহ তারা, কেহ রামতারা প্রভৃতি আখ্যায় তাহাকে অভিহিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জগবন্ধু ভদ্রের সংস্করণে চণ্ডীদাসের যে জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে ইহার নাম 'রামতারা' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। নরহরি তাহাকে 'তারা ধুবিনী' নামে উল্লেখ করিয়াছেন,——

'শুনি ভাবে মনে জানি পুন দেবি কহে কি চিন্তহ চিতে।
সুখময়ী তারা ধুবিনী দরশে ডুবিবে বিবিধ মতে॥'

আমরা তারা ধুবিনী বা রামতারা নাম গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। যদি ঐ নামই প্রকৃত হইত, তবে চণ্ডীদাস তাঁহার কোনো না কোনো পদে তাহার উল্লেখ করিতেন। যাহার প্রেমে বিভোর হইয়া কবি, কুল মান সব পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, সেই প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমার প্রকৃত নাম লিখিতে যে কবি বিস্মৃত হইবেন; তাহা আমাদের বিশ্বাস হয়না।

নান্নুরে রামী যে বাড়ীতে বাস করিত তাহার ভিটা এখনো আছে। নাই কেবল রামী, তথায় এখন আর একজন আবাস গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছে।

বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে যাঁহারা বরণ্য হইয়াছেন, চণ্ডীদাস তাঁহাদের একতম ;——

'বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসো জয়দেবঃ কবীশ্বরঃ।
লীলাশুকঃ প্রেমযুক্তো রামনন্দশ্চ নন্দদঃ॥
শ্রীগোবিন্দ কবীন্দ্রোঽন্যঃ সিদ্ধ কৃষ্ণ কবীনকঃ।
পৃথিব্যাং ধন্য ধন্যাস্তে বর্ণ্যাস্তে সিদ্ধ রূপিনঃ॥'
এতান্ দ্বিজবরান্ বন্দে সপ্তবারিধিতুল্যকান্।
যেষাং সংস্মৃতি মাত্রেন সর্ব্বসিদ্ধিঃ প্রজায়তে॥

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

(রাণীর প্রেম।)



কবি-হৃদয়ে প্রেমের অস্বাভাবিক স্ফুরণ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পরম প্রেমিক প্রেমময় বিধাতার আশীর্ব্বাদে প্রেম সকলের হৃদয়েই প্রতিভাত, তবে কাহারো হৃদয়ে বা বেশী, কাহারো হৃদয়ে বা কম। মানুষ সেই প্রেমময়ের প্রেমের অংশটুকু ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেনা; সে প্রেম একের জন্য নহে,—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলেরই তাহা এজমালী ধন; আপনা হইতেই তাহা বিশ্বসংসারে ছড়াইয়া পড়ে,—চাপিয়া রাখিতে পারা যায় না। অহঙ্কারে মত্ত হইয়া লোকে সেই প্রেমময়কেও বিস্মৃত হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার সেই প্রেমকণাটুকু সহস্র চেষ্টাতেও ভুলিতে পারেনা। জীবনে মরণে তাহারই 'চরণ সার।'

'ওরূপ মাধুরী, পাসরিতে নারি
কি দিয়ে করিব বশ।
তুমি সে তন্ত্র, তুমি সে মন্ত্র
তুমি উপাসনা রস॥

ভেবে দেখ মনে, এতিন ভুবনে
কে আছে আমার আর।
বাশুলী আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে
ধোপানী চরণ সার॥

চণ্ডীদাসের প্রেমের গভীরতা আছে, ইহা কেবল মুখের দু'টী মধুর কথা নহে। তিনি বুঝিয়াছিলেন 'Love is Heaven and Heaven is love', রামীর সহিত তাঁহার প্রেম যত নিন্দনীয় বলিয়াই না কেন লোকে ঢক্কা নিনাদে প্রচার করুক, মণিকাঞ্চনের ন্যায় রামীর সহিত তাঁহার সংযোগ না হইলে, তাঁহার প্রীতি ও কবিত্বের মূল প্রশ্রবণ বিচ্ছুরিত হইত কিনা সন্দেহ। তাঁহার প্রেম যে স্বর্গীয় পদার্থ রামী যে সামান্যা স্ত্রী নহে, তাহা আমরা ক্রমে ক্রমে দেখাইতে চেষ্টা করিব। যে প্রেমিক রজকিনী প্রেমিকাকে বলিতে পারে——

'শুন রজকিনী রামি!
ওদুটী চরণ, শীতল জানিয়া
শরণ লইনু আমি॥

যে বলিতে পারে——

'তুমি রজকিনী আমার রমণী
তুমি হও মাতৃ পিতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা যাজন, তোমারি ভজন
তুমি বেদ মাতা গায়ত্রি॥'

সে রজকিনীপ্রেম নিশ্চয় 'নিকষিত হেম'। সে প্রেমিক এ জগতের নহে, 'আর সে রামীও সামান্যা নহে।'

চণ্ডীদাসের সহিত রামমণির মিলন বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। রামী নিঃসহায় অবস্থায় ক্ষুন্নিবৃত্তির আশায় বিশালাক্ষীর মন্দিরে দাসীরূপে নিযুক্তা হইল। পরে বাশুলীদেবী তাহার সহিত প্রবর্ত্ত হইতে চণ্ডীদাসকে আদেশ করেন। চণ্ডীদাস ব্রাহ্মণ হইয়া রজকিনীতে প্রবর্ত্ত হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, বাশুলী তাঁহাকে সার উপদেশ দেন। আবার এদিকে রামী-কেও বাশুলী স্বপ্নে চণ্ডীদাসের সহিত প্রবর্ত্ত হইতে আদেশ করেন।* স্বপ্নাদেশ প্রাপ্তে রামী চণ্ডীকে সকল কথা বলিল, চণ্ডী প্রথমে তাহা বিশ্বাস করিতে চায় না। পরে

কহিছে রজকিনী রামী, শুন চণ্ডীদাস তুমি
নিশ্চয় মরম কহি জানে।
বাশুলী কহিছে যাহা, সত্য করি মান তাহা
বস্তু আছে দেহ বিদ্যমানে॥
আমিত আশ্রয় হই, বিষয় তোমারে কই
রমণ কালেতে গুরু তুমি।
আমার স্বভাব মন, তোমার রতি ধ্যান
তেঞি সে তোমায় গুরু করি মানি॥

ইহার পর চণ্ডীদাস আর কোন আপত্তি করিলেন না।— বাশুলীর আদেশ ও রামীর উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া 'ধোপানী-চরণ সার' করিলেন।

* আহা কহি বাণী, শুনহ রামিনী, একথা ভুবন পার।
চণ্ডিদাসনামে, আছে একজন, তাহারে আরোপ কর॥

কেহ কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে, চণ্ডীদাসের এতটা করা কি ভাল হইয়াছে? তুমি না হয় রামিনীকে খুব-ইভাল বাসিলে, তাই বলিয়া কি তাহার চরণ মাথায় করিতে আছে? এদুত্তর আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, চণ্ডীদাস রামীকে সামান্যা রমণী জ্ঞান করিতেন না। তিনি তাহাকে 'বেদমাতাগায়ত্রী' বলিয়া গিয়াছেন এবং তাহারো পূর্ব্বে একই জেলাতে অজয় নদীতীরে বসিয়া আর একজন সুমধুর স্বরে গাহিয়াছিলেন,

'স্মর গরল খণ্ডনং, মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদ পল্লব মুদারং।'

তাঁহারো পূর্ব্বে রামচন্দ্রের প্রণয় বর্ণনায় ভবভূতি গাহিয়াছিলেন,—'দেবি! দেবি! ত্বয়ংপশ্চিমস্তে রামশিরসাপাদ পঙ্কজা স্পর্শেঃ।' দেবি! তোমার যে চরণে রামের মস্তক লুণ্ঠিত হইত, আজি এই তাহার শেষ। সুতরাং বলা যাইতে পারে, প্রেমের শেষ পরিণতি পদ-সেবায়।

চণ্ডীদাস সম্বন্ধে নানারূপ কিম্বদন্তি প্রচলিত আছে, তাহার সত্যাসত্য নির্ণয় করা সুদুষ্কর। রামিনীর সহিত মিলনের একটি জনশ্রুতি এইরূপ। একদা চণ্ডীদাস হাটে মৎস্য ক্রয় করিতে যান। তিনি মৎস্য লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, আর একজন লোক আসিয়া সেই মৎস্য বিক্রেতার নিকট হইতে, তিনি যে পরিমাণ মৎস্য পাইয়াছিলেন, তদপেক্ষা অধিক মৎস্য সমান মূল্যে ক্রয় করিল। ইহাতে চণ্ডীদাস কৌতূহলী হইয়া সেই লোকটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়, আমার সমান

মূল্য দিলেন, অথচ মৎস্য পাইলেন বেশী, ইহার কারণ কি? লোকটী বলিল যে, মেছুনীর সহিত আমার প্রণয় আছে। এই ঘটনার পর চণ্ডীদাস প্রেমোন্মত্ত হইয়া প্রেমিকা অন্বেষণে বহির্গত হইলেন এবং নদীতীরে বিচরণ করিতে করিতে রামিনীর সাক্ষাৎ পাইলেন। চণ্ডীদাস তাহার অল্প বয়স ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিমোহিত হইলেন। রামীর রূপ যেন ফুটে ফুটে ফুটে না। তৎপর চণ্ডীদাস তাহাকে দেখিবার আশায়, সে যে ঘাটে কাপড় কাচিত, সেই ঘাটে মৎস্য ধরিবার জন্য প্রত্যহ যাতায়াত করিতে লাগিলেন। রামীর রূপ-রস-গন্ধে চণ্ডীদাসের মত্ত মন-ভৃঙ্গ যেন তাহা হইতে উঠে উঠে উঠে না। ক্রমে ক্রমে রজকিনীরও মন টলিল—উভয়ের মিলন হইল। এই কিম্বদন্তি বিশ্বাস করিবার কোন উপায় নাই। তাহাদের মিলনের প্রকৃত বৃত্তান্ত আমরা প্রথম পরিচ্ছেদেই ব্যক্ত করিয়াছে।

যাহা হউক ধোপানীর সহিত চণ্ডীদাসকে প্রবর্ত্ত হইতে দেখিয়া নান্নুরবাসিগণ তাঁহাদিগকে বিশালাক্ষীর মন্দির হইতে বিতাড়িত করিয়া দিল। অপবাদে দেশ রাষ্ট্র হইল।

পিরীতি করিল,　　জগতে ভাসিল
ধোপানী দ্বিজের সনে।
জগতে জানিল,　　কলঙ্ক ভাসিল
কণাকাণি লোক জনে॥

চণ্ডীদাস মন্দির ত্যাগ করিয়া রজকিনীর আলয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, সেই খানেই নিয়ত বাস করিতে লাগিলেন।

কাযেই গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণ তাঁহার উপর আরো খড়্গ হস্ত হই-লেন। তাঁহারা চণ্ডীদাসের ভ্রাতা প্রভৃতিকে সমাজচ্যুত করিলেন। সমাজচ্যুত হইয়া একঘরে অবস্থায় থাকার ভয়ে তাঁহার খুড়ি মাতা ও ভ্রাতা চণ্ডীদাসকে সৎপথে আনিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইলনা— চণ্ডীদাসের 'পিরীতে মজিয়াছে মন' 'হাঁড়ী ডোম মানিবে' কেন? অবশেষে চণ্ডীদাসের মাতৃ স্থানীয়া খুড়ি মাতা, রজ-কিনীর বাড়ী যাইয়া পুত্র স্থানীয় দেবর পুত্রের হাত ধরিয়া বাড়ী আনিলেন। চণ্ডীদাসের ভ্রাতা নকুল বলিলেন, 'ঘরে ঘরে সব কুটুম্ব ভোজন করিঞা উঠাব কূলে।' কিন্তু চণ্ডীদাস ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না, তিনি বলিলেন,——

'শুনি চণ্ডীদাস, ছাড়িয়া নিশ্বাস, ভিজিয়া নয়ন জলে।
ধোবিনী সহিতে, আমি যেন তাথে, উদ্ধার হইব কুলে॥
পিরীতি আলম্ব, পিরীতি, কুটুম্ব, পিরীতি সমুদ্র বিধি।
পিরীতি উন্মাদ, পিরীতি আস্বাদ, পিরীতে পাইবে নিধি॥
পিরীতি আচার, পিরীতি ব্যভার, পিরীতে তোমরা ভাই।
পিরীতের তরে, দুয়ারে দুয়ারে, আদর করিতে চাই॥

আমি বেশ জানি, ধোপানীর সহিতই কুলে উদ্ধার হইব। তুমি একি বলিতেছ? আমিত তাহাকে ত্যাগ করিতে পারিব না। পিরীতিই আমার সর্ব্বস্ব—পিরীতি কুটুম্ব, পিরীতি আচার, পিরীতি ব্যভার এবং পিরীতের জন্যই তোমরা ভাই।

যাহা হউক চণ্ডীদাসের সে কথায় ফল হইল না। 'ঠাকুর নকুল, মনেতে বাড়িল, আমন্ত্রণ ঘরে ঘরে।' নকুলকে ঘরে

ঘরে বেড়াইয়া নিমন্ত্রণ করিতে দেখিয়া গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণ অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহারা নকুলকে ধরিয়া বলিলেন,—'তুমি একজন মহাশয় ব্যক্তি তুমি ভাল কায করিয়াছ। পুত্র পরিবার ত্যাগ করিয়া ধোবিনী আবেশে থাকা অতি গর্হিত কায, তাঁহাকে ঘরে আনিয়া তুমি কুলের মুখ উজ্জ্বল করিলে।'

ব্রাহ্মণ-নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়া নকুল ভ্রাতাকে অনেক উপদেশ দিলেন। তাঁহাকে বকুল তলায় লইয়া যাইয়া বলিলেন, ধোপানীর সহিত সহবাস করা উচিত নহে, সে পিরীতিতে তুমি কি ধন পাইবে? চণ্ডীদাস বলিলেন,——

* * *

ভজন সাজন, পিরীতি সাধন, পিরীতি সেবিলে পায়॥
ভজিব পিরীতি, স্বভাব আরতী, পিরীতি পরাণ সার।
পিরীতি করম, পিরীতি ধরম, এভবে পিরীতি সার॥

চণ্ডীদাসের তন্ময়তা ও গভীর প্রেম দেখিয়া নকুলের শরীর অস্থির হইল। তিনি নিঃশব্দে গৃহে আসিয়া কুটুম্ব ভোজনের নিমিত্ত 'জিলেফি, মালপা, কচোরি আলফা পুরি, খিরি চিনি কলা পিরীতি ঔষধি' প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

খাদ্যাদির আয়োজন করিয়া নকুল স্নানার্থে ঘাটে যাইয়া দেখেন জলে বসিয়া ধোপানী পিরীতি মন্ত্র জপ করিতেছে। নকুল জলে নামিতেই ধোপানীর দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হইল। সম্মুখে নকুলকে দেখিয়া তাহার রুদ্ধ শোকাবেগ

উৎসারিত হইল। তাহার অতৃপ্ত, প্রেমামৃতবঞ্চিত, তৃষিত হৃদয় কাঁদিয়া বলিল,——

'শুনি নাকি ভাস, পিরীতি নৈরাশ, কুটুম্ব ভোজনে মন।
ঠাকুর নকুল, হয়েছ সফল, তুমি এক মহাজন॥
তোমার চরিত্র, জগত পবিত্র, তোমার সাধু সে বাদ।
তুমি সে সকল, জাত্যে পাত্যে তোল, নীচপ্রেমে উন্মাদ॥
বর্ণাশ্রম ছাড়, পিরীতিতে দড়, যাহার পিরীতি হয়।
এসব ভাবিয়া, যেজন করিল, সে কেন ভারতে রয়॥'

এই বলিয়া ধোপানী প্রস্থান করিল, নয়নের ধারায় তাহার আবক্ষ ভাসিতে লাগিল, কোন মতেই মনকে প্রবোধ দিতে পারে না। গৃহে যাইয়া শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলে তাহার ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল, মস্তকের উপাদান অশ্রু-আর্দ্র হইল। সে করযোড়ে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল, 'অগাধ, অসীম বিস্মৃতির বিরাট গহ্বরে তোমার আসৃষ্টি আজ ডুবাইয়া দাও।' অনেকক্ষণ পর কিছু সুস্থ হইয়া ধোপানী আর একবার চণ্ডীদাসকে দেখিবার জন্য তাঁহার বাটী অভিমুখে যাত্রা করিল। বাটীর নিকটস্থ হইয়া এক বকুল তলায় বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। হঠাৎ সেই স্থান দিয়া নকুল যাইতেছিলেন তিনি তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন——

'নকুল পাএ্যাত, ধরি দুটী-হাতে, ধোপিনী কাঁদিয়া বলে।
তুমি মহাজন, শুনহ ব্রাহ্মণ, পিরীতির কিবা মূলে॥

আমি অতি হীন, পিরীতি অধীন, পিরীতি আমার গুরু।
এ তিন আখর, হৃদয়ে যাহার, সে জনা কল্পতরু॥
পিরীতি ভজিল, পিরীতি সাধিল, পিরীতি একান্ত মনে।
চণ্ডীদাস সাথে, ধোবিনী সহিতে, মিশ্রিত একই প্রাণে॥

নকুল ধোপানীর আক্ষেপে অন্তরে বিগলিত হইলেন সত্য কিন্তু কার্য্যোদ্ধারের নিমিত্ত তাহাকে দূর্ দূর্ করিয়াতাড়াইয়া দিলেন। তাহার পর নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণ উপনীত হইলে 'পত্র দিয়া গেল, ব্রাহ্মণ বসিল, অন্ন আন চণ্ডীদাস।' ব্রাহ্মণগণের আদেশানুযায়ী চণ্ডীদাস 'দিঞা করতালি, হরি হরি বলি' অন্ন আনিতে গেলেন। চণ্ডীদাস অন্ন পরিবেশন করিয়া গেলেন, পরে——

ব্যঞ্জন কটোরা, শাক সূপ ভরা
ঝাল নাফরাদি আনে।
আনিল ঘণ্টের ব্যঞ্জন সকল
সুখে খায় দ্বিজগণে॥

সুখে খাইতে খাইতে দ্বিজগণ ব্যঞ্জনের গুণ 'বাখান' করিতে লাগিলেন এবং পুণরায় অন্ন আনিতে চণ্ডীদাসকে ডাকিলেন। এবার চণ্ডীদাস যেই ব্যঞ্জন লইয়া উপস্থিত হইলেন, অমনি ধোপানী তাঁহার সম্মুখে উপনীতা হইয়া বলিল—'কিরে চণ্ডে! তুই নাকি আমাকে ছেড়ে জাতে উঠ্‌ছিস্?' চণ্ডীদাসের স্ফূর্ত্তি দমিয়াগেল, তাঁহার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল! তিনি ব্যঞ্জন লইয়া চিত্র পুত্তলিকারন্যায় নিঃশ্চেষ্টভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ব্রাহ্মণগণ দেখিতে পাইলেন, চণ্ডীদাসের দুই হাতে ব্যঞ্জনের

থালা আবদ্ধই আছে, অথচ আর দুই খানি হাত বাহির করিয়া তিনি রজকিনীকে আলিঙ্গন করিলেন। রজকিনীর দেহ হইতে সেই সময়ে এক অনির্ব্বচনীয় জ্যোতিঃ বহির্গত হইয়া দ্বিজগণকে বিমোহিত করিল। তাহার গৌর মুখমণ্ডল মধ্যাহ্ন-রবিকরে লাবণ্যময় হইয়া উঠিল। যাঁহারা জন্ম-মৃত্যু-পীড়িত, দুখঃ-বিষাদ-তাড়িত মানব-জীবনে বীতরাগ হইয়া কুহেলিকা-বেষ্টিত সূত্র-ভাষ্যের পদানুসরণ করতঃ লোকালয় অপেক্ষা বনচর-সেবিত অরণ্য জীবনকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা করিতেন, সেই বর্ণগুরু ব্রাহ্মণগণ তখন 'রামীত সামান্যা নহে' জ্ঞান করিয়া তাহাকেও পরিবেশন করিতে আজ্ঞা করিলেন। ব্রাহ্মণাজ্ঞায় রামী পরিবেশন করিতে প্রবৃত্তা হইলে, হঠাৎ তাহার অবগুণ্ঠন বায়ুতাড়িত হইয়া স্থান ভ্রষ্ট হইল। ব্রাহ্মণগণ দেখিতে পাইলেন, সে যেন আরো দুইখানি হাত বাহির করিয়া অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল। এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনা অবলোকন করিয়া তাঁহারা চণ্ডীদাসের জাতি মারিবার সংকল্পত্যাগ করিলেন। 'পিরীতি হইল জয়ী।'

চণ্ডীদাস ও রামীর প্রেমে কাম গন্ধ নাই। চণ্ডীদাসের মানুষী প্রেম সীমা উল্লঘন করিয়া অমানুষিক প্রেম-রাজ্যের সামগ্রী হইয়াছে। তাঁহারা যে পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্য মিলিত হন নাই, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বাশুলীর আদেশে জানিতে পারিয়াছি। তাঁহাদের রূপ যৌবনে উপভোগ লালসা ছিলনা; চণ্ডীদাস বলিয়া গিয়াছেন 'রজকিনী রাধা হয়।'

স্থানে স্থানে তিনি তাহাকে 'পিতৃ মাতৃ', 'বেদমাতা গায়ত্রী' বলিয়া অভিহিত করিয়াও পরিশেষে অঞ্জলি দিয়াছেন,——

আসক দিঞাসে, শুন রজকিনী
রহিনু চরণ তলে।

কি নিঃস্বার্থ অকপট প্রেম! এপ্রেম মূর্ত্তি কি স্বর্গীয় প্রেমের স্বপ্ন বলিয়া আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়না? চণ্ডীদাসের ভাষার দিকে লক্ষ্য ছিলনা, কেবল হৃদয়ের গূঢ় অন্তস্তল হইতে প্রেমময়ী তৃষা বাহির করিয়া জগৎকে মাতাইয়াছেন। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্য ছিল কেবল,——

'পিরীতি নগরে বসতি করিব পিরীতে বান্ধিব ঘর।
পিরীতি পরসি পিরীতি প্রিয়সী অন্ত সকলি পর॥
পিরীতি সোহাগে এদেহ রাখিব পিরীতি করিব বল।
পিরীতি বিকথা সদাই কহিব পিরীতে গোঙাব কাল॥
পিরীতি পালঙ্কে শয়ন করিব পিরীতি বালিস মাথে।
পিরীতি বালিসে আলিস করিব রহিব পিরীতি সাথে॥
পিরীতি সাগরে সিনান করিব পিরীতি জল যে খাব।
পিরীতি দুঃখের দুঃখিনী যে জন পরাণ বাটিয়া দিব॥
পিরীতি বেশর নাসাতে পরিব রহিব বন্ধুয়া সনে।
হৃদয় পিঞ্জরে পিরীতি থুইব দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥

যদি পিরীতি করিতে হয়, তবে যেন চণ্ডীদাসের মতই পিরীতি করি, যদি কলঙ্ক কিনিতে হয়, তবে যেন জন্ম জন্মান্তরে তাঁহারই ন্যায় প্রেম-কলঙ্ক পসরা শিরে বহন করিয়া আধুনিক কবি-কল্পনা-প্রসূত প্রেম-উচ্ছাস, বিরহ প্রভৃতি একঘেয়ে আলোক হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইতে পারি।

যাহা হউক, ব্রাহ্মণাদি ভোজন করাইয়া চণ্ডীদাস জাতিতে উঠিলেন। কিন্তু লোক গঞ্জনায় তাঁহাদিগকে অস্থির হইতে হইল। একদা রামিনী লোকগঞ্জনার কথা চণ্ডীদাসকে বলিয়া নান্নুর ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিল। চণ্ডীদাস তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন,——

'ইন্দ্র আদি কারি, সুর নর দানব, তিনপুর জিনিল দশ মাথে।
বিশ বাহুপর, বিজয় ধনুর্দ্ধর, নৃপতি নিশাচর নাথে॥
মণিময় কুণ্ডল, রত্ন সব আভরণ, শোভা করল দশমুণ্ডে।
দিগ্বিজয় করি, বিক্রম কেশরী, ছত্র ধরল নব খণ্ডে॥
সোহা লঙ্কাপতি, দৈবে হরল মতি, বিপদ সময় ভব ভেল।
রতন মুকুট পর, বনচর বানর, চরণ ঘাত কত দেলা॥
হরি হরি, দৈব কি গতি নাহি জান।
কভু সুখ সম্পদ, কবহুঁ রাজপদ, কবহুঁ গুরু অপমান॥
ভণয়ে চণ্ডীদাস ইহা বড় বাত।
হানি,লাভ, জীবন, মরণ, সুখ, যশ, অপযশ বিধি হাত॥'

কি সুন্দর উপদেশ! আমারা কয়জন এরূপ উপদেশ দিতে জানি? চণ্ডীদাস প্রেমিকার চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত ভাষার নিরাবিল পবিত্র দেহে কুরুচির কালিমা তুলিপাত করেন নাই,- তিনি পুণ্যপুঞ্জময় পবিত্র সৌন্দর্য্য দেখাইয়াই তাহাকে সান্ত্বনা করিয়াছেন। অনন্ত বিশ্বের অনন্ত সৌন্দর্য্যের সারভূত সৌন্দর্য্য সুধা তিল তিল করতঃ সঞ্চয় করিয়া প্রেমিকাকে উপঢৌকন দিয়াছেন। এ প্রেমে কি কাম গন্ধ থাকিতে পারে?

তাহার পর চণ্ডীদাস বলিলেন, যদি লোকাপবাদ তোমার নিকট এতই অসহনীয় হইয়া থাকে, তবে আমাদের উভয়ের

স্থান পরিত্যাগের প্রয়োজন কি ? তুমি থাক, আমিই অন্যত্র যাইতেছি। তচ্ছ্রবনে রামিনী কাতর কণ্ঠে বলিলেন,——

'কোথা যাবে অহ, প্রাণ বঁধু মোর, দাসিরে উপেক্ষা করি।
না দেখিয়া মুখ, ফাটে মোর বুক, ধৈরজ ধরিতে নারি ॥
বাল্যকাল হইতে এদেহ সঁপিনু মনে আন নাহি জানি।
কি দোষ পাইয়ে মথুরা যাইবে বলহে যে কথা শুনি ॥
তোমার শারথি ক্রুর অতিশয় বোধ বিচার নাই।
বোধ থাকিলে দুঃখ সিন্ধুনীরে অবলা ভাসাতে নাই ॥
পিরীতি জ্বালিয়া যদি বা যাইবা কবেবা আসিবে নাথ।
রামীর বচন করহ শ্রবণ দাসীরে করহ সাথ ॥'

আজ কাল রমণীগণ যেমন পদাহতা অভিমানিনী কাল-সাপিনীর ন্যায় সামান্যতেই ঊর্দ্ধশিরে গর্জ্জিয়া উঠে, রামিনীর সে রূপ তীব্র তেজে গর্জ্জন নাই। তাহার সম্বলের মধ্যে কেবল ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রেমটুকু আর অশ্রু। তাই সে তাহার সংযত পবিত্র উদার হৃদয়ের সমস্ত প্রেমটুকু ঢালিয়া চণ্ডীদাসের করুণা প্রার্থনা করিল।

অতঃপর কলঙ্ক স্খালনের নিমিত্ত তাঁহারা এক পরামর্শ স্থির করিলেন। চণ্ডীদাস পীড়ার ভাণ করিয়া তাঁহার পর্ণ কুটীরে শয়ন করিলেন। দুই দিবস যায়, চণ্ডীদাস কেবলই ছট্‌ ফট্‌ করিতেছে, তাঁহার শুশ্রূষায় লোক কেহই নাই। পিতা মাতা ইতি পূর্ব্বেই স্বর্গারোহন করিয়াছেন। চণ্ডীদাস বিনীত ভাবে প্রতিবেশিদিগের নিকট একটুকু জল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলনা, দুই দিনের উপবাস-ক্লিষ্ট ব্রাহ্মণের আন্তরিক

প্রার্থনাটুকুও কেহ গ্রাহ্য করিলনা। পর দিবস কোন সাড়া শব্দ নাই। প্রতিবেশিগণ মনে করিল, চণ্ডীদাস বোধ হয় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। তাই কোন কোন সহৃদয় গ্রামবাসী এক পা এক পা করিতে করিতে তাঁহার কুটীরে যাইয়া উঁকি মারিয়া দেখে, চণ্ডীদাস মরিয়া আছেন এবং তাঁহার গৃহ-প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ উপবাসী হইয়া আছেন। অনন্তর ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সৎকারের ও দেব সেবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কতিপয় ব্রাহ্মণ মিলিত হইয়া চণ্ডীদাসকে শ্মশানে লইয়া গিয়া চিতায় তুলিয়া যেমন অগ্নি সংযোগ করিবে, এমন সময়ে প্রেম-বিহ্বলা, আলুলায়িত কুন্তলা রামিনী উন্মাদিনীবেশে তথায় যাইয়া বিলাপ করিতে লাগিল।

'তুমিদিবাভাগে, লীলা অনুরাগে, ভ্রম সদা বনে বনে।
তাহে তবমুখ, না দেখিয়া দুঃখ, পাই বহু ক্ষণে ক্ষণে॥
ত্রুটি সমকাল, মানি সুজঞ্জাল, যুগতুল্য হয় জ্ঞান।
তোমার বিরহে, মনস্থির নহে, ব্যাকুলিত হয় প্রাণ॥
কুটিল কুণ্ডল, কত সুনির্ম্মল, শ্রীমুখ মণ্ডল শোভা।
হেরি হয়মনে, এদুই নয়নে, নিমেষ দিয়াছে কেবা॥
যাহে সর্ব্বক্ষণ, তব দরশন, নিবারণ সেই করে।
ওহে প্রাণাধিক, কি কব অধিক, দোষ দিয়া বিধাতারে॥
তুমি যে আমার, আমি সে তোমার, সুহৃৎ কে আছে আর।
খেদে রামী কয়, চণ্ডিদাস বিনা, জগৎ দেখি আঁধার॥'

অন্তিমের এক মাত্র পথ মহাশ্মশানে দাঁড়াইয়া রামিনী বেশে রাধিকার এই বিরহ গীতি ধ্বনি যেন হতাশ্বাস বিষাদ ও অনন্ত ব্যাথার পসারা লইয়া কোন্ দূর দূরান্তরের স্বপ্নরাজ্যে

লইয়া যাইতেছে। রামিনীর বিলাপ শুনিয়া চণ্ডীদাস যেন নিদ্রাভঙ্গের পর চিতা হইতে উত্থিত হইয়া বলিলেন,—'চল, এদেশ হইতে আমরা প্রস্থান করি, আর এখানে থাকিবনা!' চণ্ডীদাসের কথায় রামিনীর অশ্রু শুষ্ক হইল, তাঁহারা আনন্দাতিশয্যে গাহিতে গাহিতে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

শ্মশান বন্ধুগণ ভাবিলেন, চণ্ডীদাসকে ভূতে পাইয়াছে, তাই তাঁহারা প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলেন। তাঁহাদের পলায়নে শিবা ও সারমেয় দল লুব্ধনেত্রে চাহিয়া চাহিয়া ছুটিতে লাগিল। শীঘ্রই গ্রামে একটা হট্টগোল পড়িয়া গেল।

এদিকে বিনোদ রায়* নামক এক ব্রাহ্মণকে বাশুলী দেবী স্বপ্নে বলিলেন, 'গ্রামবাসীগণ আমার সেবক ও সেবিকার মিথ্যা কলঙ্ক রটাইয়া তাঁহাদিগকে অস্থির করিয়াছে। যদি তাহারা চণ্ডীদাসের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা না করে, তবে তাহাদিগকে আমি সবংশে নিধন করিব।' বিনোদ প্রত্যূষে স্বপ্ন বৃত্তান্ত সকলকে জানাইল। রটনাকারীগণ স্বপ্নের বিবরণ শুনিয়া ভীতঃ চকিত ও সন্ত্রাসিত হইয়া চণ্ডীদাসের নিকট ভূয়োভূয়ো ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তাঁহার অলৌকিক কার্য্য সন্দর্শনে অনেকে চণ্ডীদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। বিনোদ রায়ও তাঁহার নিকট রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইল। এই সময় একদা রামিনী চণ্ডীদাসের

* বিনদ রায় বন্ধু বিনোদ রায়।
ভাল হ'ল ঘুচাইল পিরীতের দায়॥

নিকট হাসি মুখে যাইয়া বলিল, পাষণ্ডগণের প্রতি ভগবানের করুণা-বর্ষিত হইয়াছে। ধোপানীর প্রেম যে অপবিত্র নহে এখন তাহাদের জ্ঞান হইয়াছে।

চণ্ডীদাস উত্তর করিলেন,——

"কুল অভিমান, নাহি মোর জ্ঞান, না দেখি যখন তোরে।
তুয়ার আগকে, যতন করিঞা, বিরতি করাঞ মোরে॥
তুমার পারা, করিঞা আমারে, সঙ্গিনী করিঞা নিবে।
তিলেক বিচ্ছেদে, শতবার মরি, চরণ একান্ত দিবে॥
চণ্ডীদাসে কয়, মনে হেন লয়, বলিব কি আর তোরে।
আসক দিঞাসে, স্থন রজকিনী, রহিলুঁ চরণ তলে॥

"চণ্ডীদাসের গীতি-প্রেমের নিখুঁত ছবি এবং নির্ভীক উক্তি; যে সমাজে ব্রাহ্মণ ও ইতর বর্ণের অধিকার স্বর্ণ ও লৌহের ভিন্ন ভিন্ন রেখায় নির্দ্দেশিত, সেই সমাজের ক্ষুদ্র একজন পূজক ব্রাহ্মণ—'শুন রজকিনী, রহিলুঁ চরণ তলে' প্রভৃতি বন্দনা দ্বারা অত্যাশ্চার্য্য নির্ভীকতা প্রদর্শন করিয়াছেন, একথা লিখিতে তিনি সমাজের ভয়ে কিছু মাত্র কাতর হন নাই; কারণ প্রেমের বলে পিপীলিকাও মত্ত হস্তীকে দলন করিতে পারে। একথা লিখিতে তিনি লজ্জিত হন নাই,—কারণ এ প্রেমে 'কাম গন্ধ' নাই—ইহা তাঁহার 'উপাসনা রস',—ইন্দ্রিয় লিপ্সার উর্দ্ধে; ইহা স্বীকার করিয়া ব্রাহ্মণ গৌরবান্বিত হইয়াছেন। তিনি লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া পড়েন নাই।"*

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

চণ্ডীদাস বিবাহ করেন নাই, আজন্ম কুমার থাকিয়াই অতিবাহিত করিয়াছেন। রামিনীর প্রেমে তাঁহার হৃদয়ে যে মদিরাময় উল্লাস সঞ্জাত হইয়াছিল, তাহা ত্যাগ করিয়া অন্য দারপরিগ্রহের চিন্তাও কোন দিন তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। তাঁহার পদাবলীর অনেক স্থানে 'বড়ু' শব্দ পাওয়া যায়,—ইহার এক অর্থে 'কুমার' বুঝায়।

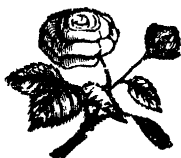
চণ্ডীদাসের রজকিনী-প্রেম আমি নিন্দনীয় বলিয়া প্রকাশ করিতে প্রস্তুত নহি। ভাল বাসার রাজ্যে আবার হাড়ি ডোম ভেদ কি? প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে 'নাস্তি তেষু জাতি বিদ্যা রূপকুল ধন ক্রিয়াদি ভেদঃ'। তাহাদের মধ্যে জাতি, বিদ্যা, রূপ, কুল, ধন এবং ক্রিয়ার ভেদ নাই। যেখানে ভেদ দেখিতে পাইবে, সেইখানেই জানিবে অকপট প্রেমের অভাব। প্রেম রাজ্যে জাতি ভেদ, বর্ণভেদ স্থান পায়না। অতি অন্তজঃ বর্ণও যদি তোমাকে প্রাণটী ভরিয়া ভালবাসে, তোমার সাধ্য আছে কি তাহাকে পদদলিত কর? আর তুমি যত বড় মহান্ পুরুষই কেন হওনা, রজকিনী কেন, একটি চণ্ডালও কি তোমাকে ভালবাসিতে পারেনা? সে যদি তোমাকে প্রাণটী ভরিয়া ভালবাসে, তবে তুমি কয়দিন তাহাকে উপেক্ষা করিয়া কাটাইতে পার? গুহক চণ্ডাল শ্রীরামচন্দ্রকে 'ওরে হারে' বলিয়া সম্বোধন করিতেন বলিয়া লক্ষ্মণ তাঁহাকে হনন করিতে উদ্যত হন। শ্রীরামচন্দ্র তখন কি বলিয়া অনুজকে নিরস্ত করিয়াছিলেন? তিনি কি বলেন নাই,—'আমার বন্ধুর কোন

দোষ নাই, ও যে প্রেমে বিহ্বল হইয়া আমাকে 'ওরে হারে' বলিয়া ডাকে! আমিও উহাকে অতিশয় ভালবাসি।' শবরী চণ্ডাল-কন্যা। প্রেমের প্রভাবে সে পঞ্চবটি বনে শ্রীরামচন্দ্রকে উচ্ছিষ্ট ফল খাওয়াইতে পারেন নাই কি?

চণ্ডীদাস প্রেমের কবি, তিনি প্রফুল্ল কণ্ঠে প্রেম-সংগীত গাহিতে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিল,—সাহিত্যের পুষ্টি সাধন তাঁহার উদ্দেশ্য ছিলনা। তিনি বাঙালী ছিলেন, তাই বাঙলা ভাষায় গান গাহিয়া, হৃদয়ের অতৃপ্ত প্রেম-কাহিনী ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার প্রেমময় লেখনী-নিঃসৃত যে অমূল্য রত্নরাজি সাহিত্যভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়া উহার কলেবর শ্রীসম্পন্ন করিয়াছে তাহা তাঁহার অজ্ঞাতসারেই সংঘটিত হইয়াছে,—সাহিত্য উন্নত করার কল্পনা কোন দিনই তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। তিনি নিজের মনে নিজের প্রাণে বিপুল উচ্ছ্বাস সহকারে মরমের নিভৃত প্রান্ত হইতে যে প্রেম-সংগীত গাহিয়াছিলেন, তাহাই দৈবক্রমে বঙ্গভাষার—মাতৃভাষার অলঙ্কার স্বরূপ হইয়া গিয়াছে তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কত শত কবি-কোকিল বঙ্গীয় কবিতাকানন মুখরিত ও ঝঙ্কৃত করিয়াছে।

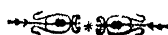
১৩৭৩শকের হস্ত লিখিত প্রাচীন পুঁথিখানিতে পাওয়া যায়, রামিনীর পিতার নাম সনাতন ও মাতার নাম লক্ষী ছিল। তাহার অন্য একটি ভগিনী ও দুইটী ভ্রাতা ছিল, কিন্তু তাহাদের নাম জানিতে পারা যায় না। নান্নুরের তিন ক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে তেহাই নামক গ্রামে তাহাদের বসতি ছিল অল্প.

সময়ের মধ্যে রামিনীর ভগিনী ও দুইটী ভ্রাতাই এবং জননীর কাল হওয়ায়, সনাতন সংসারের আসক্তি শূন্য হইয়া একাকী গৃহ হইতে প্রস্থান করে। তাহার পলায়নের পর রামিনী কিয়দ্দিবস পৈতৃক ভিটাতেই বাস করে কিন্তু পরে খাদ্যাভাব উপস্থিত হওয়ায় সে তেহাইর মমতা ত্যাগ করিয়া নান্নুরে গমন করে এবং পরে বিশালাক্ষীর মন্দিরে দাসীরূপে স্থান প্রাপ্তা হয়। তৎকালে তাহার বয়স পঞ্চদশ বর্ষ হইয়াছিল। এই তেহাই গ্রামের সন্ধান আমরা জানিতে পারি নাই।



তৃতীয় প্রস্তাব।

(বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ।)



বৈষ্ণব ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর নাই। যে ধর্ম্ম বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু, তৃণ হইতেও সুনীচ হইতে শিক্ষা দেয়, যে ধর্ম্ম অমানী ব্যক্তিকেও মান্য করিতে উপদেশ দেয়, সে ধর্ম্মশ্রেষ্ঠ না হইলে আর কোন্ ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ বলিব ? আমরা প্রথম প্রস্তাবে বলিয়াছি, বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব মন্দীভূত হইতে আরম্ভ হইলে বৈষ্ণব ধর্ম্ম মস্তক উত্তোলন করিতে আরম্ভ করে। ইহার আর একটি প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল—শাক্ত ধর্ম্ম। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম্ম কিরূপে তাহার এই সন্নিকট প্রতিবেশি প্রতিপক্ষকে পারাভূত করিয়া প্রাধান্য বিস্তার করিল তাহা বলিবার স্থান এখানে নাই। বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সময় হইতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের যশঃ সৌরভ দিগ্ দিগন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন, শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ব্বে ভারতের ধর্ম্মরাজ্যের অবস্থা কি শোচনীয় হইয়াছিল। প্রতাপান্বিত পাঠান নরপতিগণের অমানুষিক অত্যাচার নিরন্তর সহ্য করিতে করিতে গৌড়, বঙ্গ, বিহার, রাজপুতনা, উৎকল প্রভৃতি দেশ

বাসীগণ কিরূপ দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল, মোস্‌লেমধর্ম্মের প্রবল বন্যার স্রোত কি ভাবে প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা আর তাঁহা-দিগকে নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। ভারতের এই ঘোর দুর্দ্দিনে ভগবান চৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়া যদি সকলকে সমস্ত কদাচার হইতে মুক্ত না করিতেন, খোল করতালের প্রামোদকারী নিনাদের সহিত হরিনাম কীর্ত্তন দ্বারা সেই দুশ্চিকিৎস্য রোগ হইতে আর্য্য জাতিকে উদ্ধার না করিতেন, তবে নিশ্চয়ই 'আর্য্য' শব্দ এতদিন বিস্মৃতির অতল-গহ্বরে নিমজ্জিত থাকিত।

কিন্তু চৈতন্যদেবের সেই প্রিয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের আজ কি দুর্দ্দশা! যিনি প্রকৃতির মুখ দর্শন করিতেন না, যিনি প্রকৃতির নিকট ভিক্ষা লওয়ার অপরাধে প্রিয় শিষ্য হরিদাসকেও বর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, আজ সেই মহাপুরুষের দোহাই দিয়া কত শত নরপিশাচ 'মহাপ্রভুর গুপ্ত সাধন' করিতে কত কুল বতীকে কুলের বাহির করিয়া সমাজের ঘোরতর অবনতির পন্থা সুপ্রশস্ত করিতেছে—গার্হস্থ্য সুখ শান্তিতে কণ্টক প্রদান ও মহাপ্রভুর মতে কলঙ্ক আরোপ করিতেছে! মহাপ্রভু বৈষ্ণবের লক্ষণ বলিয়াছেন,——

'প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার
কৃষ্ণনাম, পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সবাকার॥
এক কৃষ্ণ নামে করে সর্ব্ব পাপ ক্ষয়।
নববিধ ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়॥

দীক্ষা পুরশ্চর্য্যাবিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বা স্পর্শে আচণ্ডালে সবারে উদ্ধারে॥
আনুসঙ্গ ফলে করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষয়ে করে কৃষ্ণ প্রেমোদয়॥
*   *   *   *
অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণনাম।
সেই বৈষ্ণব করি তার পরম সাধন॥'

(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত,—মধ্যলীলা পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।)

একবার কৃষ্ণনাম করিলে সর্ব্বপাপের বিনাশ হয়, যে সেই কৃষ্ণনাম করে, তাহাকে বৈষ্ণব বলি। 'উৎকল খণ্ডে' লিখিত আছে—'যাঁহারা জগতে সর্ব্বদা পরের উপকার করেন, পরের কুশলে আপনার কুশল মনে করেন, পর দুঃখে কাতর হইয়া কেবল পরের ভাবনাই ভাবেন, তাদৃশ দয়াবান সদাশয় ব্যক্তি-গণই বৈষ্ণব বলিয়া বিখ্যাত। যাঁহারা পরের সম্পদকে লোষ্ট্র-বৎ জ্ঞান করেন, পর স্ত্রী ও কণ্টকাকীর্ণ শাল্মলীতে সমদর্শী, আপনার আত্মীয় বর্গ, সুহৃদ্বর্গ ও শত্রু বর্গকে সমান (আত্ম) জ্ঞান করেন, তাঁহারাই বৈষ্ণব বলিয়া প্রসিদ্ধ। যাঁহারা একা-গ্রভাবে সতত ভগবানে চিত্ত সমর্পন করিয়াছেন, গুণবান ব্যক্তির সমাদর করেন, পরের মর্ম্মকথা গোপনে রাখেন, সর্ব্ব-দাই সকলের প্রিয়কথা বলেন, তাঁহারা বৈষ্ণব বলিয়া প্রসিদ্ধ। যাঁহারা ভক্তি ভাবে কংসহন্তা কৃষ্ণের মধুর পাপনাশী শুভনাম কীর্ত্তন এবং উচ্চৈস্বরে সর্ব্বদা তাঁহার জয়ঘোষণা করেন, তাঁহারাই বৈষ্ণব বলিয়া প্রসিদ্ধ। যাঁহারা কায়মনোবাক্যে

হরিতে আত্ম সমর্পন করিয়া একাগ্রচিত্তে হরির পাদপদ্ম চিন্তা করেন, এবং সেই চিন্তাতেই বিভোর হইয়া সুখ দুঃখকে সমান জ্ঞান করেন, বিনম্র বচনে হরির স্তব এবং পূজাতেই সর্ব্বদা ব্যগ্র থাকেন, তাঁহারাই বৈষ্ণব বলিয়া 'প্রসিদ্ধ।' (১)

আজ আমরা কয়জন এরূপ বৈষ্ণব দেখিতে পাই? যে 'বৈষ্ণব সেবা' কে শচীদুলাল মুখ্য ধর্ম্ম বলিয়া বারবার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, আজ কেন আমরা সেই ভক্তকে ভণ্ড মনে করিয়া দারোয়ান দ্বারা গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেই? সেচ্ছাচারিতাই তাহার মূল। যে মহাপ্রভু, রঘুনাথকে 'মর্কট বৈরাগ্য' দেখাইতে নিষেধ করিয়া গৃহে যাইয়া গৃহ ধর্ম্ম পালন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, আজ সেই মহাপ্রভুর দোহাই দিয়া কত শত পাপাত্মা পিতৃ মাতৃ জল পিণ্ডের আশা রহিত করতঃ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া অজাত বৈরাগ্য হৃদয়ে বৈরাগীর ভেক গ্রহণ করিয়া গৌরাঙ্গের পবিত্র ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিতেছে। আজ কত শত দুরাচারী সমাজ-কলঙ্ক ধর্ম্ম ধ্বজী স্বার্থপর উপদেষ্টৃ বর্গ শাস্ত্রের কুব্যাখ্যারূপ বিষ প্রয়োগ দ্বারা কলির দুর্ব্বল মানবকে মুর্চ্ছিত করিতেছে—প্রচলিত পাপাগ্নিতে শুষ্ক ইন্ধন প্রদান করিতেছে, তাহার ইয়ত্বা নাই। কর্ত্তাভজা, গৌরীদাস, ন্যাড়া, বাউল, আউল, সহজীয়া প্রভৃতি কত শত উপধর্ম্মী তাণ্ডব নৃত্যের সহিত বিকট কোলাহল করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের কঙ্কাল লইয়া টানা হেঁচড়া করিয়া

(১) দশম অধ্যায়; শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত।

আর্য্যভূমিকে প্রেতভূমিতে পরিণত করিয়াছে, তাহা ভাবিলেও ম্রিয়মান হইতে হয়। বৈষ্ণব ধর্ম্মের এ কলঙ্ক কালিমা কি ধৌত হইবে না?

যাহা হোক্ আমরা আলোচ্য বিষয় হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। চণ্ডীদাস বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার——

রাধার কি হলো অন্তরে ব্যথা!
বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে, না শুনে কাহার কথা॥
সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘপানে, না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে, রাঙ্গা বাস পরে, যেমন যোগিনী পারা।
এলাইয়া বেণী, ফুলের গাঁথনি, দেখয়ে খসায়ে চুলি।
হসতি বয়ানে, চাহে মেঘপানে, কি কহে দুহাত তুলি॥
একদিঠ করি, ময়ূর ময়ূরী, কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয়, নব পরিচয়, কালিয়া বধুঁর সনে॥

পাঠে বৈষ্ণব ধর্ম্মের কথাই মনে পড়ে।

শ্রীচৈতন্যপ্রভুও কৃষ্ণপ্রেমে এমনি আত্মহারা হইয়াছিলেন। চণ্ডীদাসের রাধিকার এভাব কি বৈষ্ণব সাধুদিগের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয় না? 'নীল নিচোল পরিহিতা রাধিকা মূর্ত্তিই বৈষ্ণব সাহিত্যে সুলভ, কিন্তু রাঙ্গাবাস (গেরুয়া)-পরা রাধিকা এখানে সন্ন্যাসিনীর মত, তাহার পরিধান গেরুয়া এবং আহারের বিরতি (উপবাস আচরণ) ও মেঘ দেখিলেই কৃষ্ণভ্রমে করজোড়ে সকাতর অনুনয়, একদৃষ্টে ময়ূর ময়ূরীর কণ্ঠ দেখিয়া বর্ণমাধুর্য্যে

মুগ্ধ হইয়া পড়া, এসকল বৈষ্ণব সাধুভক্তগণের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।'*

একে কুলবতী ধনী তাহে সে অবলা।
ঠেকিল বিষম প্রেমে কত সবে জ্বালা॥
অকথন বেয়াধি এ কহা নাহি যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়॥
পায়ে ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়।
সোণার পুতুলি যেন ভূমেতে লোটায়॥
পুছয়ে কানুর কথা ছল ছল আঁখি।
কোথায় দেখিলা শ্যাম কহ দেখি সখি॥
চণ্ডীদাস কহে কাঁদ কিসের লাগিয়া।
সে কালা আছয়ে তোর হৃদয়ে জাগিয়া॥

'এই স্বর্ণ-পুত্তলি প্রেমিকার নয়ন-পুত্তলি কোন সুন্দরীর ছবি বলিয়া মনে করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। যিনি ধূলিময় প্রাঙ্গণ ভূমিতে ইতর জাতির মুখেও হরিনাম শুনিলে অবলুণ্ঠিত হইয়া তাহার পদে পড়িতেন, সেই স্বর্ণপুত্তলি গৌর হরির ছবিরই পূর্ব্বাভাস যেন এই পদে সূচিত হইতেছে।"*

চণ্ডীদাসের রাগাত্মিক পদাবলীতে বড়ই কঠিন তত্ত্ব বিচিত্রভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি চণ্ডীদাসের সময়ে বৈষ্ণব ও শাক্ত সম্প্রদায়ে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বীতা চলিতেছিল। শাক্তদিগের সাধন সংগীতাবলী প্রহেলিকাময় ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। তাহারই প্রভাবে চণ্ডীদাসও রাগাত্মিক পদাবলীতে ঐ রূপ প্রহেলিকাময় ভাষা ব্যবহার না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

তাঁহার এই সকল পদাবলী পাঠে অনুমান হয়, যে তিনি অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে ও বৈষ্ণব ধর্ম্মে নিগূঢ় আস্থাবান হইবার পূর্ব্বে সে গুলি রচণা করিয়াছিলেন। কারণ কোন বৈষ্ণব কবিরই ভাষা এরূপ জটিল নহে এবং বৈরাগ্য ভাবাপন্ন কোন কবিই তৎপ্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিয়া কাব্যাদি প্রণয়ণ করেন নাই। চণ্ডীদাসের কথিত 'সহজ সাধন' অতীব কঠিন অল্প লোকেই তাহা সাধন করিতে পারেন। তাই কবি গাহিয়াছেন—

সহজ আচার, সহজ বিচার, সহজ বলিব কায়।
না জানি মরম, করে আচরণ, এ বড় কঠিন দায়॥
না জানি ধরম, না জানি করম, আচরিতে করে আশ।
ত্রিদিবের গাণ, শুনিয়ে যেমন, কাকে করে অভিলাষ॥
সুধাকর দেখি, খদ্যোত যেমন, সম তেজ হ'তে চায়।
শত শত কোটী, করয়ে উদয়, তবু তার যোগ্য নয়॥
পারিজাত পুষ্প, দেবের দুর্লভ, কপিতে করয়ে আশ।
শিব নৃত্য দেখি, ভুতগণ নাচে, দেবের সমাজে হাস॥
এমন যে জন, নিত্য সহজে ঘটায়, আচরিতে করে আশ।
বাশুলী আদেশে, ভনে চণ্ডীদাসে, নরকে হইবে বাস॥

(হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি।)

এই পুঁথি খানিতে চণ্ডীদাসের বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ-সম্বন্ধে একটি গল্প বিবৃত আছে।—একদা তিনি সন্ধ্যার পর বিশালাক্ষীর মন্দির হইতে রজকিনীর আবাসে যাইতেছেন। বাড়ীর নিকট একটি বকুল বৃক্ষ তলে দীপ হস্তে একটি রমণীকে দেখিয়া তিনি তাঁহার নিকট অগ্রসর হইয়া দেখেন, স্বয়ং দশ-

ভূজা প্রদীপ হস্তে দাঁড়াইয়া আছেন। চণ্ডীদাস মহামায়ার চরণে প্রণত হইলে দেবী তাঁহাকে বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আদেশ দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। পরদিবস চণ্ডীদাস মস্তক মুণ্ডন করিয়া তুলসী কাষ্ঠের মালা গলায় দিয়া যুগল মন্ত্র গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ের সংস্করণে এ সম্বন্ধে আর একটি গল্প স্থান পাইয়াছে। পাঠকগণের কৌতুহল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল। বিজ্ঞ পাঠকগণ সত্যাসত্য নির্ণয় করিবেন। 'একদিন চণ্ডীদাস স্নানার্থে নদীতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন একটি পদ্মকোরক জলে ভাসিয়া যাইতেছে। তিনি যত্ন সহকারে ফুলটি তুলিয়া লইয়া ভাবিলেন ফুলটি কি মনোহর। এইফুলটি কি নির্ম্মাল্য ?- না, নির্ম্মাল্য হইলে ফুলটি প্রস্ফুটিত থাকিত। ফুলটি নির্ম্মাল্য নহে সিদ্ধান্ত করিয়া, মনে মনে ভাবিলেন, আজ এই সুন্দর ফুলে মা বিশালাক্ষীর পূজা করিব। স্নান কার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন করিয়া তিনি বড়ই আনন্দ সহকারে মাতা বিশালাক্ষীর পূজা করিতে বসিলেন। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভগবতীকে ফুলটি অর্পণ করিতেছেন এমত সময়ে ভগবতী আবির্ভূতা হইয়া চণ্ডীদাসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'হে ভক্ত সাধকাগ্রগণ্য! ও ফুল আমার চরণে তুমি অর্পণ করিও না, ও ফুল, আমার মাথায় দেও।" চণ্ডীদাস সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন ভগবতী স্বয়ং সম্মুখে আবির্ভূতা। চণ্ডীদাসের আর আনন্দের সীমা রহিলনা।

অমনই করযোড়ে বলিয়া উঠিলেন, 'মাগো, যোগী ঋষি কত যজ্ঞ, কত ব্রত, কত তপ করিয়া তোমাকে পায় না আজ আমার কি সৌভাগ্য যে তুমি আমাকে দর্শন দিয়াছ। যাহা হউক মা আমি ভক্তি সহকারে তোমার চরণে ফুলটি অর্পণ করিতেছিলাম কেন তুমি তাহা তোমার মাথায় দিবার জন্য আদেশ করিতেছ?" ভগবতী কহিলেন, 'হে ভক্ত শ্রেষ্ঠ! ও ফুলটিতে আমার গুরুর অর্চ্চনা হইয়াছে, অতএব উহা আমার মাথায় দেও।' চণ্ডীদাস উত্তর করিলেন, 'সে কি মা, তোমার আবার গুরু কে আছে?' ভগবতী বলিলেন,—'বৈকুণ্ঠপতি শ্রীগোবিন্দ আমার গুরু।' চণ্ডীদাস বলিলেন, 'মাগো, তিনি যদি তোমার পূজ্য হন, তবে আমিও অতঃপর তাঁহাকে পূজা করিব।' ভগবতী 'তথাস্তু' বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন।" চণ্ডীদাস ইহার পর কৃষ্ণপরায়ণ হইলেন এবং তদ্বিষয়ক পদাবলী রচণা করিতে আরম্ভ করিলেন।

বৈষ্ণবদিগের মতে ব্রজভাবের উদয় না হইলে কৃষ্ণপ্রাপ্তি সংঘটন হয় না। ব্রজভাবে কৃষ্ণের ভজনা করাই শ্রেষ্ঠ সাধন। রাধাকৃষ্ণের নিগূঢ় রস 'ব্রজ বিনা ইহা না জানে অন্য।' গোপিনীগণ ভিন্ন সে মধুর রস আর কেহ আস্বাদন করিতে পারে না। তাই অনেক বৈষ্ণব ব্রজের গোপী হইয়া জন্মিবার অভিলাষ করেন। রামাবতারে যে সকল ঋষিগণ রামচন্দ্রের কার্য্য-উদ্ধারার্থে কপিরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই কৃষ্ণলীলার গোপিনী দল। ভগবানের মাধুর্য্য রস

গোপী ভাব ভিন্ন অনুভব করা যায়না বলিয়াই তাঁহাদের এইরূপ পরিবর্ত্তন। চণ্ডীদাসও গোপী ভাব হৃদয়ে পোষণ করিতেন,—"দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে শুন শ্যামধন। কৃপাকরি এ দাসীরে দেহ শ্রীচরণ।"

বর্ত্তমান সময়ে যে সকল ভণ্ড তপস্বীগণ কপট বৈরাগ্য-ভেক গ্রহণ করিয়া পবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্মের জ্বলন্ত কুকীর্ত্তিস্তম্ভ হইতেছে, যে সকল অধর্ম্মাচারী বৈষ্ণবগণ প্রকৃতি বিনা 'গুপ্ত সাধন' হয় না বলিয়া দুই তিনটি করিয়া প্রকৃতি বামে বসাইয়া বৈষ্ণব জন্ম সফল করিতেছে, যাহাদের কুকীর্ত্তি 'ন্যাড়া-নেড়ির দরবার' বলিয়া লোকে উপহাস করিয়া থাকে, তাহারা শৃঙ্গার রসের অর্থ যাহাই করুক না কেন, চণ্ডীদাস তাহার যে অর্থ করিয়াছেন তাহা অনেকেরই জ্ঞানের বহির্ভূত।

শৃঙ্গার রস বুঝিবে কে ?
সব রস সার শৃঙ্গার এ ॥
শৃঙ্গার রসের মরম বুঝে।
মরম বুঝিয়ে ধরম যজে ॥
রসিক ভকত শৃঙ্গারে মরা।
সকল রসের শৃঙ্গার সারা ॥
কিশোরা কিশোরী দুইটি জন।
শৃঙ্গার রসের মুরতি হন ॥
শুরু বস্তু এবে বলিব কায়।
বিরিঞ্চি ভবাদি সীমা না পায় ॥
কিশোরা কিশোরী যাহাকে ভজে।
শুরুবস্তু সেই সদা যজে ॥

চণ্ডীদাস কহে না বুঝে কেহ।
যে জন রসিক বুঝয়ে সেহ॥

রসিক ভিন্ন এরস অন্য কাহারো বুঝিবার শক্তি নাই। উপ-ভোগ-লালসা ও প্রেম এদুইটি যে বিভিন্ন তাহা উক্ত পদটীতে কবি বুঝাইয়াছেন। প্রেমকে তিনি বড় উচ্চ অঙ্গের জ্ঞান করিতেন,—'পিরীতি করিয়া ভাঙ্গয়ে যে। সাধন অঙ্গ না পায় সে॥' প্রেম ভঙ্গ করিলে তাহার সাধনা নষ্ট হয়, যাহার হৃদয়ে প্রেম বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহার মন অন্য দিকে 'টলিয়াও টলে না'

শাক্ত ও বৈষ্ণব, হিন্দুদিগের এই দুই সম্প্রদায়ই প্রধান এবং এই দুই সম্প্রদায়ের নিকটই বঙ্গভাষা সমধিক ঋণী। শাক্তদিগের কল্যাণে বাঙ্‌লা পদ্য জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকিলেও বৈষ্ণবদিগের প্রসাদে উহা শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে। বৈষ্ণবগণ বাঙ্‌লা পদ্যে যে সরলতা, যে মধুরতা প্রদান করিয়াছেন, শাক্তগণ তাহা দিতে পারেন নাই, তাহার কারণ বৈষ্ণবগণ সৌন্দর্য্যের উপাসক, শাক্তগণ ভীমকান্তির উপাসক। বৈষ্ণব গ্রন্থের তুলনায় শাক্ত-গ্রন্থ নগণ্য। শাক্তগণ ধ্যানে অনুরক্ত, বৈষ্ণবগণ সংগীতে অনু-রাগী। বৈষ্ণবগণ যে সমুদয় পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিলে প্রাণ আকুল করে। নিম্নোদ্ধৃত রাধি-কার বিরহ গীতিটি শ্রবণ করিলে কোন্ হৃদয়বান্ ব্যক্তিই না ব্যথিত হন;—

সুখের সায়রে, দুঃখ উপজিল, ভাঙ্গিল যৌবন মোর।
আপনা জানিয়া, পিরীতি করিলাম, বন্ধুয়া হইল পর॥

সুজন দেখিয়া, পিরীতি করিলাম, কুজন বলিবে কে ?
অমৃত বলিয়া, গরল ভক্ষিলাম, ঢলিয়া পড়িনু সে ॥
আপনা ভাবিয়া, পিরীতি করিলাম, পর কি আপনা হয়।
মিছা প্রেম করি, কান্দি কান্দি মরি, দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় ॥

(হস্ত লিখিত প্রাচীন পুঁথি।)

শাক্তদিগের গ্রন্থ পাঠ করিলে, দেশের অতীত কালের কোন কথাই জানা যায় না, পরন্তু বৈষ্ণব সাহিত্য আলোচনা করিলে অন্যূন চারিশত বৎসর পূর্ব্বেরও সামাজিক অবস্থা আচার ব্যবহার প্রভৃতি সুন্দররূপে অবগত হওয়া যায়। পুরা-তত্ত্ব হীনতার জন্য আমাদের চিরকলঙ্ক থাকিলেও বৈষ্ণব সাহিত্য পাঠ করিয়া বৈষ্ণব দিগের সম্বন্ধে আমরা যে টুকু জানিতে পারি, শাক্ত সাহিত্য হইতে শাক্তদিগের সম্বন্ধে সে টুকুও জানিবার কোন উপায় নাই। নবদ্বীপ, বৃন্দাবন প্রভৃতি বৈষ্ণব তীর্থ গুলি এখনো কেমন সজীব, পরন্তু ক্ষীরগ্রাম, নল-হাটী, চণ্ডীপুর প্রভৃতি শাক্ত তীর্থ গুলি তেমনি নির্জীব। বৈষ্ণব-গণ সুললিত পদাবলীর দ্বারা যেমন আমাদের কর্ণকুহর পবিত্র করিয়া গিয়াছেন, তেমনি প্রাচীন আচার ব্যবহার সম্বন্ধেও কথ-ঞ্চিৎ লিপি বদ্ধ করিয়া অতীত অন্ধকারের মধ্যে খদ্যোতের ক্ষীণ রশ্মি বিকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। এ অংশেও শাক্ত সাহিত্য হইতে বৈষ্ণব সাহিত্য আদরণীয় ও উপকারী। লোক চিত্তের উপরও বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব সামান্য নাই। চণ্ডী-দাস যখন বাশুলী-মন্দির হইতে বিতাড়িত হইয়া রামিনীর

সহিত তাহার আবাসে অবস্থান করিতে ছিলেন, তখন একদা নান্নুরের একজন সুরাপায়ী সমাজ-কলঙ্ক দুষ্টবুদ্ধি ব্যক্তি তাহা-দিগকে বিড়ম্বিত করিবার অভিপ্রায়ে, তাহাদের শয়ন-গৃহে একটি অজগর সর্প ছাড়িয়া দিবার মনস্থ করিয়া একটি মৃৎ-পাত্রে একটি সর্প ধরিয়া রজনীযোগে রজকিনীর গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল! রজকিনীর গৃহের সন্নিকট উপস্থিত হইয়া সুরাপায়ী শুনিল, চণ্ডীদাস গাহিতেছেন.——

পরের বেদনা পর কি জানয়ে, পর কি আনের বশ।
পরের পিরীতি আন্ধারে বঁসতি, কিবা সে জানয়ে রস॥
রসিক হইলে রস কি ছাড়য়ে, সুদৃঢ় চতুর জনা।
যত বড় তেঁহো রসের রসিক, সে সব গেলহি জানা।

(হস্ত লিখিত পুঁথি।)

পদগুলি তাহার কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিল। ভক্তের নিকট পাপীর পরাজয় হইল। তন্মুহূর্ত্ত হইতে তাহার জীবন-স্রোত অন্যগতি অবলম্বন করিল! সে হাঁড়ী শুদ্ধ সর্পটি অদূরে নিক্ষেপ করিয়া চণ্ডীদাসের নিকট উপনীত হইয়া তাঁহার চরণ ধরিয়া অপরাধ উল্লেখ পূর্ব্বক বার বার ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল।

বৈষ্ণবদিগের প্রভাব সম্বন্ধে 'ভক্তমাল' গ্রন্থেও অনেক অলৌকিক গল্প স্থান পাইয়াছে। আমরা তাহার একটি মাত্র এস্থলে পাঠকগণকে উপহার দিলাম।

এক ব্যাধ পক্ষীবধের নিমিত্ত তীর ধণুক লইয়া এক সরোবরতীরে গমন করিল। তাহাকে দেখিবা মাত্র সমস্ত পক্ষীগুলি উড়িয়া 'যঃ পলায়তি স জীবতি' নীতির মর্য্যাদা রক্ষা করিল। সুযোগমত পুণরায় পাখী মারিবে এই আশায় ব্যাধ একবৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত আছে, এমন সময় এক বৈষ্ণব স্নানার্থে সরোবরে অবতরণ করিল। তাঁহাকে দেখিয়া একটি পক্ষীও উড়িয়া পলায়ন কিম্বা ভীতি চিহ্ন প্রকাশ করিল না। এই ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া ব্যাধ ভাবিল, তবে আমিও বৈষ্ণবের পরিচ্ছদ গ্রহণ করি, তাহা হইলে আমাকে দেখিয়াও আর পাখী পলাইবে না এবং এই উপায়ে আমি সহজেই বহুতর পক্ষী বধ করিতে পারিব। এইরূপ স্থির করিয়া ব্যাধ বৈষ্ণব বেশ ধারণ করিয়া সরোবরে অবতরণ করিল; এবার একটি পক্ষীও তাহাকে দেখিয়া পলায়ন করিল না। সে সুযোগ বুঝিয়া পক্ষী বধের নিমিত্ত যেমনি হস্ত প্রসারণ করিবে, অমনি কে যেন সহসা তাহার হৃদয়-মন্দিরে আবির্ভূত হইয়া তাহার হৃদয়-তন্ত্রী অন্য দিকে ফিরাইয়া দিল। তাহার আর পক্ষী বধ করা হইলনা, তাহার নয়ন-যুগল হইতে অবিরল ধারায় অশ্রু পতিত হইয়া আবক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল,—'পাষাণ গলিল সে করুণার প্লাবনে।' সে ভাবিল, সেবকের বেশ ধারণ করাতেই পক্ষী পশু প্রভৃতি এতদূর বিশ্বাস করিয়া আমার চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছে, নাজানি প্রকৃতভক্ত হইলে তাহারা আরো কি বা করে? হায়, আমি এতদিন কি অন্ধ-

কারেই রুদ্ধ ছিলাম। যাহা হৌক্ আর আমি এ মধুর বেশ ত্যাগ করিব না। সেই হইতে ব্যাধ বৈষ্ণব হইয়া গেল।

বৈষ্ণবদিগের সাধণ প্রণালী অতিব কঠিন, তাঁহাদের অনুশাসন অতিশয় দুরূহ। বৈষ্ণবসাধু কামিনীকাঞ্চন বিষধরবৎ পরিহার করেন এবং প্রকৃত বৈরাগ্য জন্মিলে বিষয়ে আসক্তিও জন্মায় না। রামানন্দ রায়, রূপসনাতন, রঘুনাথ দাস প্রভৃতি জগৎ-পূজ্য বৈষ্ণবগণই ইহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। প্রকৃতই যিনি সংসারের কোন সংবাদই রাখেন না, তাঁহার চরণ-মূলে রাজার রাজমুকুটও বিলুণ্ঠিত হয়। 'বৈরাগ্য শতকে' একযোগী কোন এক রাজাকে বলিয়াছিলেন যে, আমরা সামান্য বল্কল পরিধান করিয়া সন্তুষ্ট হই, তোমরা দুকূল পরিধান করিয়া পরিতোষ লাভ কর। কিন্তু উভয়ের পরিতোষই সমান, প্রভেদ এই যে আমরা দুকূল পাইলেও যেমন সন্তুষ্ট বল্কল পাইলেও তেমনি সন্তুষ্ট হই, পরন্তু বল্কল পরিতে তোমরা কষ্ট অনুভব কর। তাহার কারণ তোমাদের ভোগ লালসার নিবৃত্তি হয় নাই,—দরিদ্র ব্যক্তির কখনো তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় না। মনকে লইয়াই সুখ দুঃখ। মন যদি সন্তুষ্ট থাকে তবে দরিদ্রই বা কে আর ধনীই বা কে? বৈষ্ণবের মনে সদা সন্তোষ বিরাজ করে, কাযেই তাহার কিছু অভাব বোধ হয় না—সে ধনী। আর অবৈষ্ণব, অসাধুর মনে কখনো ভূমানন্দের উৎপত্তি হইতে পারে না, সে মহাপ্রতাপান্বিত হইলেও তৃষ্ণা-পীড়িত, কাযেই দরিদ্র। যাহার যত লালসা তাহার তত অভাব, বিনা অভাবে

তৃষ্ণা থাকিবে কেন? যাহার লালসার নিবৃত্তি হইয়াছে, যাহার অভাব পূর্ণ হইয়াছে, তাহার তৃষ্ণারও চিরনিবৃত্তি হইয়াছে। কিন্তু ভোগের দ্বারা এ তৃষ্ণা নিবারণ হয় না,—যোগের দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা নিবৃত্ত হইয়া থাকে। যদি ভোগের দ্বারাই তৃষ্ণা নিদূরিত হইবার সম্ভাবনা থাকিত, তবে এত দিনেও কি আমাদের এ ঘোর পিপাসার উপশম হইত না! মনুর অনুশাসনে ব্যক্ত, কাম ভোগ দ্বারা কখনো কামের উপরতি হয় না বরং অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদানের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। ভোগের দ্বারা কামের বৃদ্ধিই হইয়া থাকে মাত্র। বৈষ্ণব মাত্রেই এই কামের প্রভাব হইতে বিনির্মুক্ত। চণ্ডীদাস সংক্ষেপে যে তত্ত্ব কথা গাহিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া আমরা এ প্রস্তাবের উপসংহার করিলাম।

সদা বল তত্ত্ব তত্ত্ব কত তত্ত্ব শুন।
চব্বিশ তত্ত্বে হয় দেহের গঠন॥
পঞ্চভূত ক্ষেত্র তেজ মরুৎ বোম আপ।
ষড় রিপু কাম ক্রোধ লোভ মদ মাৎসর্য্য দম্ভ॥
দশ ইন্দ্র ক্ষত তারা হয়ত পৃথক।
জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বিবিধ নামাত্মক॥
জ্ঞানেন্দ্রিয় জিহ্বা কর্ণ নাসাত্মক চক্ষু।
কর্ম্মেন্দ্রিয় হস্তপদ গুহ্যলিঙ্গ বপু
মহদ্ভূত অহঙ্কার আর হয় জ্ঞান।
এইত হয় চব্বিশ তত্ত্ব নিরূপণ॥
কিবা কারিকরের আজব কারি কুরি।
তার মধ্যে ছয় পদ্ম রাখিয়াছে পুরি॥

সহস্রারে হয় পদ্ম সহস্রেক দল ।
তার তলে মণিপুর পরম শিবের স্থল ।।
নাসা মূলে দ্বিদল পদ্ম খঞ্জনাক্ষী ।
কণ্ঠে গাঁথি ষোড়শ দল পদ্ম দিল রাখি ।।
হৃদ-পদ্ম নিম্মিত আছে শতদলে ।
কুল কুণ্ডলিনী দশ দল হয় নাভি মূলে ।।
নাভির নিম্ন ভাগে প্রেম সরোবর ।
অষ্টদশ পদ্ম হয় তাহার ভিতর ।।
তস্য পরে নাড়ী ধরে সার্দ্ধ তিন কোটি ।
স্থূল সূক্ষ্ম বত্রিশ তারা কিবা পরিপাটি ।।
লিঙ্গ মূলে ষড়দলাম্বুজ নিয়োজিত ।
গুহ্য মূলে চতুর্দ্দল পদ্ম বিরাজিত ।।
এই অষ্ট পদ্ম দেহ মধ্যেতে আছয় ।
মতান্তরে হৃদ পদ্ম দ্বাদশ দল কয় ।।
সহস্র দল অষ্টদল দেহ মধ্যে নয় ।
এই দুই পদ্ম নিত্য বস্তুর আধার হয় ।।
ষট চক্রের মূল মৃণাল হয় মেরুদণ্ড ।
শিরসি পর্য্যন্ত সে ভেদ করি অণ্ড ।।
দণ্ড দুই পার্শ্বেতে ঈড়া পিঙ্গলা রহে ।
মধ্যে স্থিত সুষমণা সদা প্রবল বহে ।।
মূল চক্র হয় হংস যোগের আধার ।
অষ্ট দল চক্রে লীলার সঞ্চার ।।
দ্বিদল চক্রেতে হয় অমৃত নির্ভর ।
আর পঞ্চ চক্রে পঞ্চ বায়ুর সঞ্চার ।।
প্রাণ, অপান ব্যান, উদান, সমান ।
কণ্ঠাম্বুজ বধি চতুর্দ্দলে অবস্থান ।।

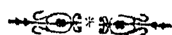
কণ্ঠ পদ্মে উদান হৃদিতে বহে প্রাণ।
নাভির ভিতরে সমান করে সাধন॥
চতুর্দ্দলে অপান সর্ব্ব ভূতেতে ধ্যান।
মুখ্য অনুলোম বিলোম সকল প্রধান॥
অজপা নামেতে তারা কুম্ভক রেচক।
অনুলোম ঊর্দ্ধ রেতা বিলোম প্রবর্ত্তক॥
প্রবর্থ সাধন হৃদ-নাভি পদ্মের অশ্রয়।
সিদ্ধার্থ সহস্রারে আছয়ে নিশ্চয়॥
রতি স্থির প্রেম সরোবর অষ্টদলে।
সাধনের মূল এই চণ্ডীদাস বলে॥

মনে বৈরাগ্য উদয় না হইলে সাধনার সিদ্ধিলাভ ঘটে না; সাধনার প্রথম স্তরেই বৈরাগ্যযোগ বা বিষাদযোগ। তত্ত্ব জ্ঞান সহজে উদয় হইতে পারে কিন্তু বৈরাগ্য সহজে উদয় হইবার নহে। প্রিয় পুত্র দারাসুতের মায়া মমতা কি শীঘ্র ত্যাগ করা যায়? 'স্বাত্মতত্ত্বাভিগ মনং ভবতি প্রায়শোনৃণাং। মুনে বিষয় বৈরাগ্যং কদার্থাদুপজায়তে।" আত্মতত্ত্ব বরং অল্লায়াসে লাভ হয় কিন্তু বিষয়ে বৈরাগ্য লাভ অতি কষ্টে ঘটে। সাধন স্থায়ী করিতে হইলে বৈরাগ্যের আবশ্যক, আবার বৈরাগ্য স্থায়ী করিতে হইলে অতিশয় শ্রম স্বীকার করিতে হয়। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে বৈরাগ্য স্থায়ী ভাবে থাকে বলিয়াই তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠ বলা যায়।



চতুর্থ প্রস্তাব।

(বিদ্যাপতির সাক্ষাৎ।)



জাতীয় সাহিত্য জাতীয় জীবনের প্রধান উপকরণ। সাহিত্য জাতিয়গৌরব-চিহ্ন। যে জাতির সাহিত্য যত উন্নত ও পরিশুদ্ধ, সে জাতিও তত প্রতিষ্ঠান্বিত। জাতীয়-সাহিত্যই জাতীয় জ্ঞান, জাতীয় স্মৃতি, জাতীয় শক্তি। যে জাতি জাতীয় সাহিত্য উন্নত, পরিপুষ্ট করিতে পারে সে জাতি এক অচিন্ত্য ঐশী শক্তি প্রভাবে জাতীয় প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে। সাহিত্যের এই চিরস্থায়ীত্ব গুণ আছে বলিয়াই জাতি বিশেষের সভ্যতার পরিমাণ—দণ্ডরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কারণ জাতীয় সাহিত্যের উন্নতিতে জাতীয় জীবন উন্নত হইয়া থাকে। জাতীয় সাহিত্যের উন্নতিতে দেশের উন্নতি—স্বজাতিরউন্নতি। আর্য্য ভারত যে একদিন সভ্য জগতের শীর্ষস্থানীয়া হইয়াছিল, তাহা কেবল সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব হইতেই। কবির রমণীয় কাব্যালাপে, বৈজ্ঞানিকের বিশ্বব্যাপিনী প্রতিভায় ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। কিন্তু হায়! সে দিন কোথায়?

পূর্ব্বে জাতীয় সাহিত্য বলিতে সংস্কৃত বুঝাইত, কিন্তু

এখন বঙ্গসাহিত্য আমাদের জাতীয় সাহিত্য; এখন তাহা যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বাঙ্গীন পরিপুষ্টি লাভ এখনো তাহার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই। তবে গত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে বঙ্গ-সাহিত্য যেরূপ উন্নত হইয়াছে, তাহাতে পুনঃ আশা হয় যে, হয়ত একদিন আমাদের জাতীয় সাহিত্যের সম্পূর্ণতা সংশোধিত হইতে পারিবে। কিন্তু জাতীয় সাহিত্য উন্নত করিতে হইলে সাহিত্য-সেবীকে উৎসাহ দান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে অনেকানেক রাজা মহারাজাগণ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকে আশ্রয় দান করিতেন, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের ধনী সন্তানগণ মধ্যে সেরূপ প্রবৃত্তি স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারে নাই। তাহা না হইলে কি দাতব্য চিকিৎসালয়ে মধুসূদন মরণের কোলে আশ্রয় লইতেন? কবিবর রাজকৃষ্ণ ও কৃষ্ণচন্দ্র অন্নকষ্টে জীবন ত্যাগ করিবেন কেন? শেষ জীবনে অক্ষয়চন্দ্রকে আদি ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় লইতে হইয়াছিল কেন? বেশি দিনের কথা নয়, সেদিন আমরা দেখিলাম, চক্ষুহীন হেমচন্দ্র দারিদ্র্যের তীব্র কষাঘাতে নিষ্পেষিত হইয়া গেলেন! দেশে কি তাঁহাকে অভয়দান করিবার একটি লোকও ছিল না? তাঁহাদের সেই ভাষাহীন অভিসম্পাতেই আমাদের সুখ শান্তি, কল্যাণ দূরে দাঁড়াইয়া থাকিবে,—'ভারত স্বধু ঘুমাইয়া রবে।'

ইংরেজ কবি সেক্ষপীয়র কতদিন হইল অমর ধামে প্রস্থান করিয়াছেন, কিন্তু আজিও ইংরেজগণ তাঁহার স্মৃতির প্রতি

কেমন সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন, তাঁহার জন্ম-তিথিতে ষ্ট্রাফোর্ড-অন-য়্যাভনে কেমন উৎসব করিয়া থাকেন, সেক্ষপীয়রের নামোল্লেখ করিয়া কেমন শ্লাঘা প্রকাশ করিয়া থাকেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সেক্ষপীয়রের কথাই বলিলাম, অন্যান্য প্রতিভাশালী সাহিত্যসেবীদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেও ইংরেজগণ কুণ্ঠিত নন। কিন্তু তাঁহারা যদি ইংলণ্ডে না জন্মিয়া ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিতেন, তবে তাঁহাদের অবস্থা কিরূপ হইত? নবরত্নের সার-রত্ন মহাকবি কালিদাস, মিথিলার মনুমেণ্ট বিদ্যাপতি, বীরভূমের বিজয়বৈজয়ন্তি জয়দেব ও চণ্ডীদাস, বাঙালীর জাতীয় জীবনের বিজয়স্তম্ভ কাশীদাস ও কৃত্তিবাস যে পথের পথিক হইয়াছেন, তাঁহাদিগকেও সেই পথের যাত্রী হইতে হইত। ইঁহাদিগের ন্যায় তাঁহাদিগের জন্যও সহানুভূতির একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে কেহ অগ্রসর হইত না! হায়, বাঙালী জাতি, কবে তোমাদের এ কলঙ্ক দূর হইবে? কবে তোমরা সাহিত্য-সেবীর পূজা করিতে আরম্ভ করিবে?

বাঙালী জাতি যদি গুণীর আদর করিতে জানিত, সাহিত্যসেবীর স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে জানিত, তবে কি আজ আমাদিগকে তাঁহাদের জীবনী আলোচনা করিতে বসিয়া অন্ধকারের মধ্যে দিয়া লেখনী চালনা করিতে হইত। আমরা যে জ্ঞান-সমুদ্রের তীর হইতে কত দূরে পড়িয়া আছি, তাহা ভাবিলেও স্তম্ভিত হইতে হয়।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি সম সাময়িক; উভয়েই চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান থাকিয়া কাব্য-সুধা বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাপতি মিথিলাধিপতির সভায় ও চণ্ডীদাস নান্নুরের বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরে থাকিয়া প্রেমসংগীত গাহিতেন। কিন্তু বিদ্যাপতির অপেক্ষা চণ্ডীদাস খাঁটিও শ্রেষ্ঠ প্রেমিক,—গীতিকাব্যে তাঁহার অপেক্ষা উচ্চ স্থান আর কাহাকেও দেওয়া যাইতে পারেনা। তাঁহার ভাষা আড়ম্বরহীন, বহুলউপমা বর্জ্জিত। বিদ্যাপতিকেও আমরা প্রগাঢ় প্রেমিক ও ভক্ত বলিয়া বার বার প্রণাম করি, কিন্তু তাঁহার ভাষা উপমা বাহুল্য ও অনাবশ্যক আড়ম্বরে ভারাক্রান্ত! "চণ্ডীদাসের কতিপয় অশ্রুশিক্ত-পদ কুসুমের সুরভির ন্যায় প্রকৃতি আপনা আপনি দ্বার উদঘাটন করিয়া প্রচার করিতেছে—শিক্ষার কর্ষণ আবশ্যক হয় নাই. তদীয় গীতি কবিতার সরস অক্ষরে কণ্টকাকীর্ণ কুসুমের ন্যায় সুধাও বিষ মিশ্রিত প্রেমের কথা একত্র গ্রথিত রহিয়াছে; কাব্যক্ষেত্রে চণ্ডীদাস প্রভু কর্ম্মক্ষেত্রে চৈতন্যপ্রভুর ন্যায় অন্য এক প্রেমাবতার। বিদ্যাপতির কবিতা টীকা-টিপ্পনী দিয়া ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু চণ্ডীদাসের পদ যিনি নিজে আস্বাদ করিতে না পারিবেন, তাঁহার নিকট অপরাপর বৈষ্ণবীয় পদের সঙ্গে সে গুলি একই মূল্যে বিকাইবে। তাদৃশ পাঠকগণ সম্বন্ধে বিদ্যাপতির কথায় বলা যাইতে পারে,—

কাচ কাঞ্চন না জানয়ে মুল।
গুঞ্জা রতন করই সমতুল॥

যো কিছু কভু নাহি কলারস জান।
নীর ক্ষীর দুহুঁ করই সমান॥” *

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সম সাময়িক হইলেও, বিদ্যাপতি প্রথম প্রেম সংগীত গাহিতে আরম্ভ করেন, তাঁহার যশঃসৌরভে চণ্ডীদাসের যশঃ সৌরভ চাপা পড়ায় তাহা বিস্তৃত হইতে কিছু বিলম্ব হয় ও চলাচল পক্ষেও কিছু ব্যাঘাত করিয়াছিল। কিন্তু চণ্ডীদাসের ভাব-সন্মিলন, অনুরাগ, স্বয়ংদৌত্য, খণ্ডিতা প্রভৃতিতে যে সৌন্দর্য্য ও কমণীয়তা আছে তাহা বিদ্যাপতিতে নাই। অবশ্য বিদ্যাপতিও তাঁহাকে কোনো কোনো অংশে পরাজয় করিয়াছেন। তাঁহার প্রবাস, মান, রসোগদার, মাথুর কল্পনার অমৃতময় সৌরভে টলটলায়মান। তাঁহাদের উভয়েরই নায়ক সেই প্রেমকেলি মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণ এবং নায়িকা সেই বিরহ দুঃখ-কাতরা পাগলিনী শ্রীরাধিকা। প্রভেদ এই যে চণ্ডীদাসের অধিকাংশ পদ রাধা ভাবে ও বিদ্যাপতির অধিকাংশ পদ সখা ভাবে চিত্রিত। চণ্ডীদাস কেবল প্রেমিক, বিদ্যাপতি প্রেমিক ও ভক্ত। একজনের পদ তরল রসে ভরপুর, সহজ ভাবে মনোজ্ঞ আর একনের পদ চমৎকারিতায় মাতোয়ারা, গভীরতায় চিত্তহারা। বিদ্যাপতির কবিত্ব-শক্তি ঈশ্বর প্রদত্ত—বিবিধ বিচিত্রভাব অঙ্কনে সুদক্ষ, চণ্ডীদাসের কল্পনা স্বীয় নায়ককে কথনো নাপিতানী, কথনো দেয়াসিনী কথনো বৈদ্য, কথনো ডুবারু বেশে সাজাইয়া নাটকাভিনায়কের কৃতিত্ব দেখাইতে সক্ষম।

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

বিদ্যাপতি মিথিলার শৈবধর্ম্মাবলম্বী নরপতি শিবসিংহের। প্রিয় সভাসদ ছিলেন। রাজা সময় সময় প্রজাগণের অবস্থা দেখিতে বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করিতেন। চণ্ডীদাসের কবিত্ব-সৌরভ বিদ্যাপতির নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলে ও রামীর সহিত তাঁহার অলৌকিক প্রেম-বন্ধন-সংবাদ কর্ণে পৌঁছিলে তাঁহার সহিত দেখা করিতে বিদ্যাপতির প্রবল বাসনা জন্মে। তিনি বাসনা চরিতার্থ করিবার অবসর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে অবসরও জুটিল। রাজা কোন কার্য্যোপলক্ষে বর্দ্ধমান জেলায় গমন করিতে উদ্যত হইলে, তিনি ও তাহার সঙ্গ লইলেন। যথা সময়ে বর্দ্ধমানে উপনীত হইয়া বিদ্যাপতি রূপনারায়ণ নামক এক ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া নান্নুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। চণ্ডীদাস এই সংবাদ জানিতে পারিয়া তাঁহার অভ্যর্থনার নিমিত্ত লিখিত গ্রাম ত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমানের রাস্তা বহিয়া চলিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহাদের মানসিক অবস্থা পদকল্পতরুর একটী গীতে ব্যক্ত হইয়াছে।——

চণ্ডীদাস শুনি, বিদ্যাপতি গুণ, দরশনে ভেল অনুরাগ।
বিদ্যাপতি তব, চণ্ডীদাস গুণ, দরশনে ভেল অনুরাগ॥
দুহুঁ উৎকণ্ঠিত ভেল।
সঙ্গহি রূপনারায়ণ কেবল বিদ্যাপতি চলি গেল॥
চণ্ডীদাস তব রহই না পারই চললহি দরশন লাগি।
পন্থহি দুহুঁ জন দুহুঁ গুণ গায়ত দুহুঁ হিয়ে দুঁহু রহু জাগি।
দৈবহি দুঁহু দোঁহা দরশন পাওল লখই না পারই কোই।
দুঁহু দোঁহ নাম শ্রবণে তহি জানল রূপনারায়ণ গোই॥

চণ্ডীদাস বর্দ্ধমান অভিমুখে চলিতেছেন, বিদ্যাপতি বীরভূম অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। পথিমধ্যে মধ্যাহ্ন সময়ে গঙ্গাতীরে এক বটবৃক্ষ মূলে উভয়ে উভয়ের সাক্ষাৎ পাইলেন। তথায় বসিয়া উভয়ে উভয়ের কবিত্ব, রসিকতা, পাণ্ডিত্য অনুভব করিতে লাগিলেন। চণ্ডীদাস বলিলেন,——

সময় বসন্ত, যাম দিন মাঝ হি বটতলে সুরধুনী তীর।
চণ্ডীদাস কবি, রঞ্জনে মিলল, পুলকে কলেবর গীর॥
দুঁহুজন ধৈরজ ধরই না পার।
সঙ্গহি রূপনারায়ণ কেবল দুঁহুক অবশ প্রতিকার॥ ধ্রু
ধৈরজ ধরি দুঁহু. নিভৃতে আলাপই, পুছত মধুর রসকি?
রসিক হইতে কিয়ে, রস উপজায়ত, রস হইতে রসিক কোহি॥
রসিক হইতে. কিয়ে হোয়ত, রসিক হইতে রসিকা।
রতি হইতে প্রেম, প্রেম হইতে রতি, কিয়ে কাহে মানব অধিকা॥
পুছত চণ্ডীদাস, কবিরঞ্জনে, শুন তঁহি রূপনারায়ণ।
কহ বিদ্যাপতি, ইহ রস কারণ, লছিমা পদ করি ধ্যান॥

বিদ্যাপতির উত্তর,——

রসের কারণ, রসিকা রসিক কায়াটি ঘটনে রস।
রসিক কারণ রসিকা হোয়ত, যাহাতে প্রেম বিলাস॥
স্থূলত পুরুষে কাম সূক্ষ্ম গতিঃ স্থলত প্রকৃতি রতি।
দুঁহুক ঘটনে, যে রস হোয়ত. এবে তাহা নাহি গতি॥
দুঁহুক যোটন, বিনহি কখন, না হয় পুরুষ নারী।
প্রকৃতি পুরুষ যে কিছু হোয়ত, প্রেম পরচারি॥
পুরুষ অবশ প্রকৃতি সবশ, অধিক রস যে পিয়ে।
রাত সুখ কালে, অধিক সুখহি তানাকি পুরুষে পায়ে॥
দুঁহুক নয়নে, নিকসয়ে বাণ, বাণ যে কামের হয়।
রতির যে বাণ, নাহিক কাসস, তবে কৈছে নিকসয়॥

কাম দাবানল, রতি যে শীতল সলিল প্রণয় পাএ।
কুল কাঠ খড়, প্রেম যে আধেয়, পচনে পিরীতি নাএ॥
পচনে পচনে, লোভ উপজিয়া, যব ভোল দ্রবময়।
সেই বস্তু এবে, বিলাতে উপরে তাহাকে রস যে কয়॥
ভণে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসতথি, রূপনারায়ণ সঙ্গে।
দুঁহু আলিঙ্গন, করল তখন, ভাসল প্রেম তরঙ্গে॥

উত্তর প্রদানান্তর দুই কবি দৃঢ় আলিঙ্গনে-বদ্ধ হইলেন। পরে উভয়ের কুশল বার্ত্তাদি জানিবার পর, তথায় অনেকক্ষণ বসিয়া উভয়ে উভয়ের পাণ্ডিত্য' রসিকতার পরিচয় পাইয়া একত্রে নান্নুরে আগমন করিলেন। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতিকে নিজের ভ্রাতা নকুল ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের সহিত আলাপ পরিচয় করাইয়া দিলেন। তাঁহার জনকজননী পূর্ব্বেই স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা স্বর্গ হইতে কবিবর 'বিষয়ি বারবিস্কী' বিদ্যপতি ঠাকুরের চরণ স্পর্শে স্বীয় কুটির পবিত্র হইতে দর্শন করিলেন! পথিমধ্যে সুরধুনী তীরে বটবৃক্ষ মূলে যেখানে উভয় কবির প্রথম সাক্ষাৎ হয়, সেই স্থানেই তাঁহারা স্নানাদি করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে তাঁহারা নান্নুরে চণ্ডীদাস কুটীরে উপনীত হন। বিদ্যাপতির অভ্যর্থনার নিমিত্ত চণ্ডীদাস পূর্ব্বেই আয়োজন করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় রূপনারায়ণের সহিত তাঁহাকে পরিতোষ পূর্ব্বক অন্যান্য ব্যঞ্জনাদির সহিত 'জিলেপি, মালপা, সীতামিশ্র' আদি মিষ্টান্ন আহার করাইলেন। আহারান্তে উভয় কবি অনেকক্ষণ আলাপাদি করিয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

পরদিবস প্রাতঃকালে উভয়ে শয্যা ত্যাগ করতঃ স্নান করিয়া বিশালাক্ষ্মীর মন্দিরে দেবী সন্দর্শনার্থ গমন করিলেন। চণ্ডীদাস নানা বিধ সুগন্ধী পুষ্প দিয়া সভক্তি চিত্তে বিশালাক্ষ্মীর পূজা করিতে বসিলেন, বিদ্যাপতি নিকটে বসিয়া ছল ছল নেত্রে দেবীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। পূজা শেষ হইলেউভয়ে একত্রে জগদ্ধাত্রীর রাতুল চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন।

মধ্যাহ্ন সময়ে আহারাদি করিয়া বিদ্যাপতি রামমণির সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। চণ্ডীদাস প্রথমে সে কথা উড়াইয়া দিলেন, পরে তাঁহার নিতান্তআগ্রহ দেখিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া রজকিনীর আলয়ে গমন করিলেন। বিদ্যাপতি রজকিনীর সহিত আলাপ করিয়া প্রীত ও তাহার অকৃত্রিম প্রেম ও ভক্তিনিষ্ঠা দর্শনে বিস্মিত হইয়া বলিলেন, 'রজকিনী সামান্য স্ত্রী নহে।' রামমণির প্রতি চণ্ডীদাসেরও অত্যধিক আসক্তি ও ভালবাসা দেখিয়া বিদ্যাপতির মনে হইল, চণ্ডীদাসের কথাই সত্য, চণ্ডীদাস 'মরিয়া হইবে রজকের ঝি।'

তৎপর তাঁহারা উভয়ে চণ্ডীদাসের কুটীরে প্রত্যাগমন করিলেন। তথায় কিয়দ্দিবস সুখে অবস্থান করিয়া বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বর্দ্ধমান যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের আর কখনো দেখা হয় নাই, তবে মধ্যে মধ্যে উভয়ে উভয়ের সংবাদ লইতেন ও তাঁহাদের কবিতা আদান প্রদান চলিত।

চণ্ডীদাস আজন্ম দুঃখে প্রতিপালিত, তাই তিনি দুঃখের কবি। দুঃখের সহিত মনের ভাব গুলি সহজ ভাষায় ব্যক্ত

করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি প্রাচীন কবিকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। চণ্ডীদাসের সুখ দুঃখে সমান জ্ঞান,—জগৎকে প্রেমময় বলিয়া জ্ঞান করিতেন। সুদীর্ঘ বিরহের পর মিলনেও তাঁহার সুখ নাই। তিনি দুঃখের মধ্যে সুখের অগ্নিশিখা অনুভব করিতেন; দুঃখের মধ্যে সুখের শীতল কণা তাঁহার গাত্র-স্পর্শ করিত। তাঁহার সুখের মধ্যেও আশঙ্কা অথচ দুঃখের প্রতিও অনুরাগ। বিদ্যাপতি সুখের কবি, অল্পতেই ধৈর্য্য-হারা হইতেন,—বিরহে কাতর হইয়া পড়িতেন। পৃথিবীর মধ্যে প্রেমকেই তিনি শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন।

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস কতদিন হইল, এই নশ্বর জগৎ ত্যাগ করিয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে স্মরণ করিবার কোন চিহ্নই নাই—কোন স্মৃতি স্তম্ভই ধরণীর মূক বক্ষে দণ্ডায়-মান থাকিয়া অতীতের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় না। কেবল তাঁহারা কাব্যোদ্যানে যে অতুলনীয় সৌন্দর্য্য রাখিয়া গিয়া-ছেন, সেই সৌন্দর্য্যে, সেই সৌরভে অদ্যাপিও আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বিস্মৃত হইতে গেলেই তাঁহাদের সেই অমর বীণার অমর কাব্য-রাগিনী আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়া বিহ্বল করিয়া ফেলে।

"Sweet Bidyapati! Sweet Chandidas! the earliest stars in the firmament of Bengali literature! Long, long will your strains be remembered and sung in Bengal!" *

* Literature of Bengal——R. C. Dutt.

পঞ্চম প্রস্তাব।

(কবিত্ব।)



নিত্য পরিবর্ত্তনশীলা চিররহস্যাবগুণ্ঠিতা প্রকৃতির সুগভীর যবনিকাভ্যন্তরে নিমজ্জিত হইয়া, মানব যখন তাহার প্রবহমানা আনন্দধারা আপন হৃদয়ে অনুভব করিতে পারে, তখন প্রকৃতির ভাবা ব্যক্ত করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় সহজেই সে উৎকণ্ঠিত হয়। তাহার হৃদয়ের শিরায় শিরায়, প্রতি রোমকূপে সেই সৌম্য সৌন্দর্য্য যতই অভিসিঞ্চিত হয়, ততই প্রকাশ করিবার জন্য তাহার ব্যগ্রতা বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে। প্রকৃতি দীপ্ত হৃদয়কে জগতে বিকশিত করিয়া তুলাই তাহার একমাত্র বাসনা হয়। এই আকাঙ্ক্ষা, বাসনার ফলেই সাহিত্যের (কাব্যও ইহার মধ্যে) সৃষ্টি। এইজন্যই কাব্যের বা সাহিত্যের আদিঅন্ত মধ্য কেবলই মধুর, কেবলই আনন্দ। যে কাব্যে আনন্দের যত স্ফূর্ত্তি,—সে কাব্যও তত উন্নত, তত গভীর।

কণ্ঠস্বর সুমোহন হইলেও শ্রবণেন্দ্রিয় ও মানব তৃপ্তির নিমিত্ত বাক্য সংযোগ প্রয়োজনীয়। এইরূপ বাক্য সংযোগে ও বিভিন্ন প্রকারে বাক্যবিন্যাসের চতুরতায় গীতেরও কমণীয়তা

সংশোধিত হয় এবং গীতের পূর্ণতা প্রাপ্তির ইহাই প্রধান উপায়। গীত কেহ বা রচনা করেন, কেহ বা গান করেন। যিনি রচণা করিবেন তিনিই যে গায়ক হইবেন, তাহার কোন কারণ নাই,—সুকবি মাত্রেই সুগায়ক নহে। এই রূপে গীতি কাব্যের উৎপত্তি।

সঙ্গীতেই জাতীয় চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ। প্রাণের কথা, অন্তরের ব্যথা গান ভিন্ন আর কিছুতেই সুস্পষ্ট রূপে পরিব্যক্ত হয় না। তাই আমাদের বেদে গান, পুরাণে গান মহম্মদীয় কোরাণে গান, খৃষ্টীয় বাইবেলে গান, তাই জয়দেবে গান, চণ্ডীদাসে গান, তুলসীদাসে গান, রামায়ণে গান। প্রকৃতির প্রেমের কাহিনী প্রকৃতির প্রিয় শিষ্যে গায়। তাই বুঝি পাপিয়ায় গান গায়, মলয় সমীরণে প্রকৃতির প্রশান্ত গম্ভীর সঙ্গীত প্রবাহমান। তাই বুঝি ইন্দ্রের অমরাবতীতে গান, কমলাপতির বৈকুণ্ঠে গান, ভোলানাথের কৈলাশ শিখরে বিল্ব-মূলে সঙ্গীতের মোহন তান ধ্বনিত হয়। সঙ্গীত বিষাদে সান্ত্বনা, বিরহে মিলন, শরতে জ্যোৎস্না, নিদাঘে সন্ধ্যা, অন্ধকারে আলোক।

মনকে লইয়া সুখ দুঃখ এবং সুখ দুঃখ লইয়াই সংসার। মনে সঙ্গীতের উৎপত্তি এবং সুখ দুঃখে তাহার পরিণতি। মানব জীবনের এই সাধারণ গন্তব্য পথে, প্রবল দুর্ব্বলের এই সমানাধিকারে, বঙ্গীয় কবি নিঃসঙ্কোচে প্রাণের সঙ্গীত গাহিয়াছেন। প্রকৃতি

অতুলনীয়া সৌন্দর্য্যে বিভূষিতা,—ভাষা চিরাশ্রিতা দাসী, দুঃখ দুর্দ্দিনেরও অভাব নাই এবং প্রাণের কপাটও কেহ অর্গল-বদ্ধ করিতে পারে নাই; কাযেই গীতিকাব্যের সাধারণ নিয়মে প্রস্ফুটিত হইবার পক্ষে কোন অন্তরায় নাই।

সুখ দুঃখ লইয়া সংসার হইলেও, সুখই জীবনের প্রধান লক্ষ্য। এই সুখের দিকেই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, নিরন্তর প্রধাবিত। সকলেরই উদ্দেশ্য, সুখের অধিকারী হওয়া। যিনি নিষ্কাম যোগী,—সংসারের সকল কোলাহল হইতে নিজকে স্বতন্ত্র করিয়াছেন, তাঁহারও উদ্দেশ্য সুখ,—কারণ চরমকালের পরমগতি সাযুজ্য বা মোক্ষ সুখেরই প্রকার ভেদ মাত্র। কিন্তু এই সুখ সকল সময়ে পাওয়া যায় না, মন নিত্য নূতন সুখের জন্য লালায়িত। সুখ ভিন্ন আর কিছুতেই মনের আসক্তি বা স্থিতি নাই। এই সুখের পদার্থ কোথায় পাওয়া যায়?—সৌন্দর্য্যের রাজ্যে। সৌন্দর্য্যের প্রতি পদে মনের গতি, তাহার অণুতে অণুতে মন মিশিয়া তাহাতেই বিলীন হইয়া যায়; এই জন্য সৌন্দর্য্যেই মনের পূর্ণ আধিপত্য। এই আধিপত্যই তাহার মুক্তি, স্বাধীনতা এবং সুখের শেষ সীমা।

সুখ সকলের উদ্দেশ্য হইলেও এ মলিন জগতে সুখ কত টুকু? বিশেষতঃ বঙ্গ ভাগ্যে দুঃখের হিসাবে সুখ ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুৎপ্রভা তুল্য। কাযেই দুঃখের গান অধিক—অনন্ত প্রায়। এ হেন দুঃখ দারিদ্র্যেও যদি বাঙালী জাতি দুঃখের গান না গায়, তবে কোন্ জাতি গাহিবে? অধীনতা, উৎপীড়ন, অবি-

চারে যে জাতির জাতীয় চরিত্র সংগঠিত ; সে জাতির অসীম দুর্ভর জীবনের বিরাম বিস্মৃতি গীতি কাব্যে। শোকাকুল দুর্ব্বল হৃদয়, কাঁদিয়া হৃদয়-ভার লাঘব করে এবং লাঘবের জন্যই গীতি কাব্য রচিত হয়। দুঃখে পড়িয়া যে কাঁদে না, সে হয় কাঁদিতে চায় না, না হয় কাঁদিতে জানে না। ক্রন্দনে দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইলেও উচ্চতার দিকে লক্ষ্য থাকে। চণ্ডীদাসের রাধিকা কৃষ্ণ বিরহে আত্মহারা হইয়া 'গরল ভখিয়া' আত্মবিসর্জ্জন দিতে উদ্যতা। হস্তে বিষপাত্র, মুখে আর দিতে পারিতেছেন না, বুঝিবা আবার দেখা হইবে। যাহার জন্য অনেক সাধনা করিয়াছেন, বুঝিবা সেই 'কালিয়া সোণা'কে আবার আমার করিয়া বক্ষে ধরিতে পাইবেন।

এই জন্যই আমরা সংগীত শ্রবণ করিতে ভাল বাসি, এই জন্যই আমরা সংগীত শ্রবণে তৃপ্ত হই। কারুণ্য, নৈরাশ্য, অলসতা, উন্মত্ততা, কাতরতা, গীতিকাব্যে একসঙ্গে ফুটিয়া উঠে। দুঃখের জীবনে দুঃখের দিনে দুঃখ প্রকাশ করিতে গীতের জন্ম। দুঃখের সুদীর্ঘ সহবাসে উহার প্রতিকূলতা আত্মীয় স্বজনের নিগ্রহবৎ হইয়া উঠিয়াছে। ইহাই অনন্ত পতনের সূত্রপাত। যে পতনে পতনের জ্ঞান থাকে না, সে পতন হইতে উত্থানের আর আশা কোথায়? উদ্ধারের আশা রাখিতে হইলে পতনের স্বরূপ বুঝিতে হইবে,—ইহার অভিব্যক্তি গীতি কাব্যে। গীতি কাব্য নিরাশার আশা। গীতে প্রাণে সাড়া পাই বলিয়া, প্রাণ অনুভব করি বলিয়া, তাহা এত আদরণীয়। সংগীত শ্রবণে

পিঞ্জরাবদ্ধ-সংকীর্ণতা ভুলিয়া বিমুক্ত বায়ু সেবনে পরিতৃপ্ত হই। রাধিকা শ্যামের মোহন বংশী রবে কুলের মানা, ধরম, করম সব ভুলিয়া কৃষ্ণেরই অনুরাগিণী হইলেন। আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন যে, তোমার জন্য আমাদের নির্ম্মল কুলে কলঙ্ক অর্শিল, অতএব তুমি যদি নিজ মঙ্গল কামনা কর, তবে আর কৃষ্ণের মুখও দর্শন করিও না। বিরহিনী রাধিকা সংকীর্ণতা ভুলিয়া গাহিলেন,——

> কাহারে কহিব, মনের মরম, কেবা যাবে পরতীত ?
> হিয়ার মাঝারে, মরম বেদনা, সদাই চমকে চিত॥
> গুরুজন আগে, দাঁড়াইতে নারি, সদা ছল ছল আঁখি।
> পুলকে আকুল, দিক নেহারিতে, সব শ্যাম ময় দেখি॥
> সখির সহিতে, জলেরে যাইতে, সে কথা কহিবার নয়।
> যমুনার জল, করে ঝলমল, তাকে কি পরাণ রয় ?
> কুলের ধরম, রাখিতে নারিনু, কহিলাম সবার আগে।
> কহে চণ্ডীদাস, শ্যাম সুনাগর, সদাই হিয়ায় জাগে॥

কেবল অধীনতা জনিত বিলাপ ধ্বনিতেই গীতি কাব্য পূর্ণ নহে। গীতি কাব্য প্রেম-ময়। মূলে আত্মপ্রেম না থাকিলে অধঃপতনে বিকার উপস্থিত হইবে কেন ? এই আত্ম-প্রেমের চরম অবস্থা—আত্মদান। কৃষ্ণ-প্রেম এই জন্যই গীতি-কাব্যের অবলম্বন। রাধিকার কৃষ্ণ-প্রেম—প্রেমের উচ্চ সীমা। কৃষ্ণের অনাদরে রাধিকার মান হইয়াছে, কিন্তু মান করিবার তাঁহার সাধ্য নাই। ইন্দ্রিয় আদি মুগ্ধ, মান করিবেন কেমনে,——

যত নিবারিয়ে তায় নিবার না যায়।
আন পথে ধাই তবু কানু পানে চায়॥
এছার রসনা মোর হইল কি বাম।
যাঁর নাম নাহি লব লয় তাঁর নাম॥
এছার নাসিকা মুঞি কত করু বন্ধ।
তবুত দারুণ নাসা পায় শ্যাম গন্ধ॥
সে কথা না শুনিব করি অনুমান।
পর সঙ্গ শুনিতে আপনি যায় কাণ॥
ধিক রহুঁ এছার ইন্দ্রিয় আদি সব।
সদায় সে কালিয়া কানু হয় অনুভব॥

ইহাই প্রেমের পরাকাষ্ঠা—অপূর্ব্ব তন্ময়ত্ব।

রাধাকৃষ্ণ প্রেম অপেক্ষা প্রেমের উচ্চাবস্থা আর কিছু কল্পনার নিরঙ্কুশ পথে পতিত হয় কি? যে ভালবাসার—আদরের—যত্নের ধন, সে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের রাজা। এমন আদর্শ প্রণয়ী ও প্রণয়িনীকে যিনি প্রকৃতির ক্ষুদ্রাংশভাবে দেখেন, তিনি প্রেমের মহত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম। কয়জন দেখিতে পান যে, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড প্রেমিক প্রেমিকার অনুরাগে অনুরঞ্জিত? প্রেমিকাকে জগন্ময় ভাবে কয়জন ভাবিতে পারেন? এই তন্ময়ত্বই বিশ্ব-বিস্মৃতি প্রেমের পূর্ণ ফটো। নিখুঁৎ প্রেমে ব্যভিচার নাই। সকলে অক্লেশে তাহা লাভ করিতে পারেনা, কিন্তু কোন প্রকারে একবার আয়ত্ত করিতে পারিলে শত জন্মেও তাহা ছাড়িতে পারা যায় না। রাধিকার বহুবর্ষ ব্যাপী বিরহে তাহার আভাষ।

কবিত্বই সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের নিদান; সুন্দরের সৌন্দর্য্য কবিত্বেরই

অংশ। সৌন্দর্য্য-সংসারে কবিত্বই অদ্বিতীয় নিয়ন্তা। এই সৌন্দর্য্য ভাব দুই প্রকার,—বস্তুগত সৌন্দর্য্য ও অবস্থাগত সৌন্দর্য্য। একটি প্রস্ফুটিত গোলাপের সৌরভে আমাদের প্রাণ পুলকিত হয়,—মন প্রফুল্ল হয়, এবং নরকের পূতিগন্ধময় দৃশ্যে সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হয়—মন তাহা হইতে দূরে পলায়ন করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু সেই গোলাপের সৌন্দর্য্য—যাহার সুরভি টুকুতে আমাদিগকে মাতাইয়া তুলে,—সেই সুগন্ধে হয়ত একটী নরকের কীট সঙ্কুচিত হইবে, নরকের দুর্গন্ধই তাহার অপার আনন্দ উৎপত্তির কারণ হইবে। এখানে গোলাপ মনুষ্যের পক্ষে সুন্দর কিন্তু নরকের কীটের পক্ষে অসুন্দর। কাযেই বস্তুর গুণের সহিত জীবের ইন্দ্রিয়গত সম্বন্ধেই বস্তুগত সৌন্দর্য্যের উদ্ভব। এবং যে বস্তু আমরা কখনো পূর্ব্বে দেখি নাই, তাহা সুন্দরই হউক বা অসুন্দরই হউক, তাহা দেখিবার জন্য মন উৎকণ্ঠিত হয় এবং দেখিয়াও তৃপ্তি লাভ করে। এই তৃপ্তিই সুখ; এই নূতনত্ব অবস্থাগত সৌন্দর্য্য। অবস্থাগত সৌন্দর্য্যের ভাব প্রধানতঃ নয়টী—সাদৃশ, নূতনত্ব, কল্পনা, ন্যায়সমাবেশ, বহুসমাবেশ, গূঢ়ানুসন্ধান, পূর্ণতা, স্মৃতি উদ্দীপনা এবং সমবেদনা উদ্দীপনা।

গীতি কাব্যে কাল্পনিক সৌন্দর্য্য; তাহা তিন প্রকার,—সাধারণ, অসাধারণ ও অসম্ভব। প্রকৃতির অনন্ত বিভবে যাহা সচরাচর আমরা দেখিতে পাই, অথবা কবির রচনা চাতুর্য্যে

যাহা নিত্য নূতন বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহাই সাধারণ সৌন্দর্য্য। রাধিকার সেই বিরহ-খেদ,——

শুন হে চিকণ কালা!
বলিব কি আর, চরণে তোমার, অবলার যত জ্বালা॥
চরণ থাকিতে, না পারি চলিতে, সদাই পরের বশ।
যদি কোন ছলে, তব কাছে এলে, লোকে করে অপযশ॥
বদন থাকিতে, না পারি বলিতে, তেঞি সে অবলা নাম।
নয়ন থাকিতে, সদা দরশন, না পেলাম নবীন শ্যাম॥
অবলার যত দুঃখ, প্রাণ নাথ! সব থাকে মনে মনে।
চণ্ডীদাস কয়, রসিক যে হয়, সেই সে বেদনা জানে॥

সাধারণ সৌন্দর্য্য। কি অপূর্ব্ব মাধুর্য্য, কি অসামান্য কবিত্ব? প্রত্যহ কতশত প্রণয়িনী প্রণয়ীর সহিত নব-প্রেমে বদ্ধ হইতেছে এবং তাহাদের বিচ্ছেদ ঘটিতেছে, কিন্তু এরূপ তন্ময়ত্ব ভাব কয় জনের হইয়া থাকে? 'বদন থাকিতে, না পারি বলিতে, তেঞি সে অবলা নাম'—এই খানেই নূতনত্ব অথচ অসাধারণ বা অসম্ভব কিছুই নাই।

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যাহা সচরাচর আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু সৃষ্টির নিয়মানুসারে তাহা সাধারণ বলিয়া অনুমিত হয় এবং যাহা কেবল আমরা কল্পনায়, বাসনায় সাজাইয়া দেখি, তাহাই অসাধারণ সৌন্দর্য্য। বাল্মীকির সীতা, পুরাণের হরিশ্চন্দ্র, সেক্ষপীয়রের ডেসডিমনা প্রভৃতিতে অসাধারণ সৌন্দর্য্য। রাধিকার এই প্রেম-বিহ্বলতা ও বিরহ কাতরতাতেও অসাধারণ সৌন্দর্য্য।

কি হৈল কি হৈল মোর কানুর পিরীতি।
আঁখি ঝরে পুলকেতে প্রাণ কাঁদে নিতি॥
শুইলে সোয়াস্তি নাই নিদ গেল দূরে।
কানু কানু করি প্রাণ নিরবধি ঝুরে॥
নবীন পানীর মীন মরণ না জানে;
নব অনুরাগে চিত ধৈরজ না মানে॥
এই রস যে না জানে সে না আছে ভাল।
হৃদয়ে রহিল মোর কানু-প্রেম-শেল॥
নিগূঢ় পিরীতি খানি আরতির ঘর।
ইথে চণ্ডীদাস বড় হইল কাঁকর॥

যাহা সচরাচর আমরা দেখিতে পাই না, যাহা সম্ভবপরও নহে এবং যাহার সহিত আকাঙ্ক্ষারও সংস্রব নাই, তাহাই অসম্ভব বা অবাস্তব সৌন্দর্য্য। এই সৌন্দর্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মোহকরী ও তাহাতে বিশেষ আকর্ষণী-শক্তি আছে। ইহার দ্বারা আমরা ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ভুলিয়া আত্মহারা, দিশে-হারা হই। মন বাস্তব সৌন্দর্য্য ছাড়িয়া ক্ষণকালের জন্য অবাস্তব সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া স্বর্গ-রাজ্যে বিচরণ করে, স্বর্গের অতুলনীয় সৌন্দর্য্য রাশিতে বিহ্বল হয়। তথায় যে সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় তাহা অপদার্থিব, অলৌকিক, অসম্ভব।

চণ্ডীদাসের কল্পনা তাদৃশ দুরূহ বিষয় লইয়া আলোচনা না করিলেও তাহাতে বাল-সুলভ চপলতা নাই, যৌবন-সুলভ লঘুতা নাই। তাঁহাতে যুবতীর যৌবন-সুলভ দোষের কথা

থাকিলেও বারবিলাসিনীর কলুষ-কুটিল কটাক্ষ নাই, লোক মোহকরী হাবভাব নাই, পরন্তু তাহাতে যুবতীর রূপ ও নবীনত্ব দেদীপ্যমান। রাধিকার বিরহ-অবস্থা বর্ণনকালে চণ্ডীদাসের কল্পনা যেরূপ শোকাতুরা হইয়া সুর ভাজিয়াছে, তাহা অনেক কবির বিরহেই দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার রাধিকা যৌবনেই সন্ন্যাসিনী—শোকাকুলা, উন্মাদিনী কিন্তু দেবসেবায় নিরত, ভক্তিতে পরিপূর্ণ। দেবলোকের ঐশ্বর্য্য চণ্ডীদাস জীবলোকে আনয়ন করিয়াছেন, সে কল্পনা উষ্ণ হইলেও উত্তাপ শূন্য।

পিরীতি সুখের, সাগর দেখিয়া, নাহিতে নামিলাম তায়।
নাহিয়া উঠিয়া, ফিরিয়া চাহিতে, লাগিল দুখের বায়॥
কেবা নিরমিল, প্রেম সরোবর, নিরমল তার জল।
দুখের মকর, ফিরে নিরন্তর, প্রাণ করে টলমল॥
গুরুজন জ্বালা, জলের শিহালা, পড়সী জীয়ল মাছে।
কুল পানী ফল, কাঁটা যে সকল, সলিল বেড়িয়া আছে।
কলঙ্ক পানায়, সদা লাগে গায়, ছাঁকিয়া খাইল যদি।
অন্তর বাহিরে, কটু কটু করে, সুখ দুখ দিল বিধি॥
কহে চণ্ডীদাস, শুন বিনোদিনী, সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া, যে করে পিরীতি, দুখ যায় তার ঠাঞি॥

কি সুন্দর তুলনা, কি চমৎকার কবিত্ব শক্তি!

চণ্ডীদাসের কবিত্ব কখন শক্তিসঞ্চারিনী, কখন নির্জ্জনাশ্রুর পরিচায়ক। বিরহ-কাতরা রাধিকা যখন নৈরাশ্যের হাহাকার রব উত্থিত করিতেছেন, তখন কবি তাঁহাকে উৎসাহবাক্যে উদ্যমশীলতায় উপস্থাপিত করিতেছেন; আবার কখনো বা

তাঁহার মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে বিগলিত হইয়া, সেই ক্রন্দন-স্বরে যোগদান করতঃ দুর্ভর শোকাবেগ প্রশমন করিতেছেন। চণ্ডী-দাসের কবিত্বে দুন্দুভিনিনাদ বা জয়োল্লাসব্যঞ্জক কিছুই নাই, আছে কেবল মৃদুমন্দ সমীরণ-সঞ্চালনজনিত বৃক্ষপত্রের শন্ শন্ শব্দ এবং রুদ্ধ হুতাশের তপ্ত দীর্ঘশ্বাস।

কালি বলি কালা, গেল মধুপুরে, সে কালের কত বাকি।
যৌবন সায়রে, সরিতেছে ভাঁটা তাহারে কেমনে রাখি॥

কি তীব্র নৈরাশ্যে উত্তেজিত হইয়া কবি রাধিকার মুখ দিয়া এই কথাগুলি বাহির করিয়াছেন! বাঙালী কবি বীরত্বের গান গাহিতে না পারিলেও কান্নার গান গাহিতে বিশেষ অভ্যস্ত। বীরত্বের গান, স্বাধীনতার গান বঙ্গের কবি সেই একদিন গাহিয়া এখন নীরব হইয়াছে, পুনরায় তাহা গাহিবার বঙ্গ-কবির আর অধিকার নাই।

চণ্ডীদাসের কল্পনাশক্তি বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। মানবতী রাধা সমীপে শ্রীকৃষ্ণের নাপিতানী, মালিনী, বিদেশিনী, বণিকপত্নী প্রভৃতি বেশে গমন বিষয়ক যে সকল বর্ণনা আছে, তাহাতে এবং অন্যান্য স্থলেও কল্পনাশক্তির বিলক্ষণ প্রাচুর্য্য লক্ষিতহয়। কিন্তু বিদ্যাপতির গীতাবলীতে যেরূপ ভাবগাম্ভীর্য্য ও বচন বৈচিত্র্য আছে, ইঁহার গীতে সেরূপ অতি কম পাওয়া যায়। ইঁহার রচনা সাদাসিদা সামান্য ভাব লইয়াই অধিক— বিশেষতঃ প্রায় সকল গীতই নিতান্ত আদিরস-সম্পৃক্ত হওয়াতে প্রীতিকর বোধ হয় না। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহাকে এক-

জন প্রধান কবি বলিয়া অবশ্য গণনা করিতে হইবে। কারণ তিনি যে সময়ের লোক, সে সময়ে ঐরূপ ছন্দোবন্দে রচনা করা সাধারণ ক্ষমতার কার্য্য নহে। তিনি তৎকালে অপরের অনুকরণ করিতে অধিক পান নাই, যাহা কিছু রচনা করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার স্বাভাবিক শক্তি-সম্ভূত বলিয়া বোধ হয়।'* তৎকালে চণ্ডীদাস অপরের অনুকরণ করিতে অধিক পান নাই' না বলিয়া অপরের অনুকরণই করেন নাই বলা আমার মতে সঙ্গত। কারণ তৎপূর্ব্বে আর যে কেহ পদাবলী রচনা করিয়াছেন, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। চণ্ডীদাসের পূর্ব্বে হিন্দুর ভারতী দেবী সংস্কৃত ভাষায় ক্রীড়া করিতেছিলেন, চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে নিম্ন গাঙ্গেয় অধিবাসীগণ দেবভাষা ছাড়িয়া বঙ্গভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেন। অজয়নদী-তীরস্থ কেন্দুবিল্বের বৈষ্ণব কবি তরল সংস্কৃতে গোবিন্দ লীলামৃত বিতরণ করিয়া অবসর গ্রহণ করিলে, তাঁহার দেশবাসী ও মৈথিলী শিষ্যদ্বয় তাঁহার পদানুসরণ করিয়া বাঙ্‌লা কাব্যের সূচনা করেন। বিদ্যাপতির দুই একটী পদের সহিত চণ্ডীদাসের পদের সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু তাহা বিদ্যাপতির অনুকরণ কি স্বভাবের অনুকরণ তাহা নির্ণয় করা কঠিন। আমরা নিম্নে বিদ্যাপতির একটী ও চণ্ডীদাসের একটী পদ উদ্ধৃত করিলাম; কে কাহার অনুকরণ করিয়াছেন বিজ্ঞ পাঠকগণ তাহা বিবেচনা করিবেন। বিচার করিবার

* বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব

সময় তাঁহারা যেন স্মরণ রাখেন বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সমসাময়িক, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিতেন এবং তৎকালে মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল না।

বিদ্যাপতির পদ—

আজ কেন তোমায় এমন দেখি।
সঘনে ঢুলছে অরুণ আঁখি॥
অঙ্গ মোড়া দিয়া কহিছ কথা।
না জানি অন্তরে কি ভেল ব্যথা॥
সঘনে গগনে গণিছ তারা।
দেব অপঘাত হৈয়াছে পারা॥
যদি বা না কহ লোকের লাজে।
মরমী জনার মরমে বাজে॥
আচরে কাঞ্চন ঝলকে দেখি।
প্রেম কলেবর দিয়াছে সাখি॥
বিদ্যাপতি কহ এ কথা দড়।
গোপত পিরীতি বিষম বড়॥*

*এই পদটী সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় 'বিদ্যাপতির প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পদাবলী' প্রস্তাবে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা প্রণিধান যোগ্য। আমরা এস্থলে তাঁহার নিজের কথাই উদ্ধৃত করিলাম।—'এই পদটীকে মনে কোন দ্বিধা না করিয়া বিনা আপত্তিতে যদি কেহ বিদ্যাপতির পদ বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বিদ্যাপতির বিশেষত্ব ও মৌলিকত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করা বৃথা। যে কয়েকটী সংকলনে এই পদ দেখিয়াছি, তাহার কোন একটিতে ইহার সম্বন্ধে কোন প্রকার অভিমত প্রকাশিত হয় নাই। বিশুদ্ধ অথবা অবিশুদ্ধ বাংলায় এখন যদি কেহ পদ রচনা করিয়া তাহাতে বিদ্যাপতির নাম জুড়িয়া দেয় তাহা হইলেও হয়ত সংকলনকার তাহাকে সংগ্রহভুক্ত করিবেন।' বঙ্গদর্শন—চতুর্থবর্ষ (নবপর্য্যায়)।

চণ্ডীদাসের রসোদ্গারের একটী পদ এই—

রাই, আজু কেন হেন দেখি।
আঁখি ঢুলু ঢুলু, ঘুমেতে আকুল, জাগিয়াছ বুঝি নিশি॥
রসের ভরেতে, অঙ্গ নাহি ধরে, বসন পড়িছে খসি।
স্বরূপ করিয়া, কহ না আমারে, মনেরমরম সখি॥
এক কাহতে, আন কহিতেছে, বচন হইয়া হারা।
রসিয়ার (রসিকের) সনে, কিবা রস রঙ্গে, সঙ্গ হয়েছে পারা॥
ঘন ঘন তুমি, মুড়িতেছ অঙ্গ, সঘনে নিশ্বাস ছাড়।
স্বরূপ করিয়া, কহ না কহসি, কপট কেন বা কর॥
ভালের সিন্দূর, আধেক আছয়ে, নয়নে আধ কাজল।
চাঁদ নিঙ্গড়িয়া, এমন করিয়া, কেবা নিলএ সকল॥
চণ্ডীদাসে কয়, যেবা সেই হয়, ভালে ভুলাইলে কাজ।
সঙ্গের সঙ্গিনী, বঞ্চিতে নারিবে, কিবা কর আর লাজ॥

স্থানে স্থানে উভয় কবির বাক্য প্রায় একরূপ। কোন্ পদটী পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল তাহা নিদ্ধারণ করিতে পারিলে কে কাহার অনুকরণ করিয়াছেন, তাহা জানা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা নির্দ্ধারণের কি উপায় আছে ?

চণ্ডীদাসের রচনা আদিরস-সম্পৃক্ত হইলেও তাহা অপাঠ্য বা অপকৃষ্ট নহে। পরবর্ত্তীকালে রামপ্রসাদ বা ভারতচন্দ্র আদিরসের তরল-বন্যায় যেমন ভাষা-সুন্দরীকে নিতান্ত দুর্দ্দশা-গ্রস্ত করিয়াছেন, তিনি তেমন কিছুই করেন নাই। তাঁহার আদিরস-সম্পৃক্ত পদাবলী পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিগণ অতি আদ:

রের সহিত আস্বাদ করিতেন। (১) তাঁহারা চণ্ডীদাসকে 'রসশেখর' উপাধি দিয়াছিলেন। (২) প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী, স্বরূপ, রামানন্দের সহিত পরম আনন্দে শ্রবণ করিতেন।

(১) জয় জয়দেব কবি নৃপতি, শিরোমণি বিদ্যাপতি রসধাম।
জয় জয় চণ্ডীদাস রসশেখর, অখিল ভুবনে অনুপাম॥

বৈষ্ণবদাস।

(২) জয় জয় চণ্ডীদাস দয়াময় পণ্ডিত সকল গুণে।
অনুপম যার যশ রসায়ণ গায়ত জগৎজনে॥
বিপ্র কুলোদ্ভব ভুবনে পূজিত অতুল আনন্দ দাতা।
যার তনু মন রঞ্জন না জানি কি দিয়া করিল ধাতা॥
সতত সে রসে ডগমগ নব চরিত বুঝিবে কে!
যাহার চরিতে ঝোরে পশু পাখী পিরীতে মজিল সে
শ্রীরাধা গোবিন্দ কেলি বিলাস যাসল বিবিধ মতে।
কবিবর চারু নিরুপম মহী ব্যাপিল যাহার গীতে॥
শ্রীনন্দ নন্দন নবদ্বীপ পতি গোরাঙ্গ আনন্দ হঞা॥
যাহার গীতামৃত আস্বাদ স্বরূপ রায় রামানন্দ লঞা॥
পরম পণ্ডিত সঙ্গীত গন্ধর্ব্ব জিনিয়া যাহার গান।
অনুক্ষণ কীর্ত্তনানন্দে মগন পরম করুণাবান॥
বৃন্দাবনে রতি যার তার সঙ্গ সতত সে সুখে ভোর।
রসিক জনার প্রাণধন গুণ বর্ণিতে নাহিক ওর॥
চণ্ডীদাস পদে যার রতি সে পিরীতি মরম জানে।
পিরীতি বিহীন জনে ধিক রহুঁ দাস নরহরি ভণে॥

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি, কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রি দিনে, গায় শুনে পরম আনন্দে(৩)॥

বঙ্গীয় কাব্যোদ্যানে চণ্ডীদাসের ন্যায় মধুর কলকণ্ঠসুদুর্লভ। তাঁহার তুলনা কেবল বঙ্গসাহিত্যেই বিরল নহে, ইংরেজি, পারশি, আরবি প্রভৃতি অন্যান্য সাহিত্যেও তাঁহার সমকক্ষ মধুবর্ষী কবির দর্শন অতি বিরল। দীনেশ বাবু বলেন, তিনি ভাষার দিকে আদৌ লক্ষ্য করেন নাই, কিন্তু ভাষা চিরাশ্রিতা দাসীর ন্যায় তাঁহার ভাবের অনুসরণ করিয়া যে সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে এবং সেই সাহিত্যে যে স্বভাব-সুন্দর চিত্র সুনিপুণ চিত্রকরের তুলিকা নিঃসৃতের ন্যায় উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত হইয়া আছে, সেরূপ পরবর্ত্তী অন্য কোন কবিই চিত্রিত করিতে সক্ষম হন নাই। গোবিন্দ দাসও চণ্ডীদাসের ন্যায় প্রেমিক ও সহজ ভাবের কবি ছিলেন, কিন্তু তাহা হইলেও তিনি চণ্ডীদাসের সমতুল্য নহেন। চণ্ডীদাসের পদ যেন স্বভাবের শান্ত শীতল সুনির্ম্মল চরণ হইতে নিঃসৃত, তাহাতে না জানি কেমন একটা মাধুর্য্য ও মাদকতা মাখান আছে, যাহা অন্য কোন কবির পদে দেখিতে পাওয়া যায় না। এবং সে মাধুর্য্য নিজে আস্বাদন

(৩) শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত; মধ্যলীলা—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীত গোবিন্দ।
এই তিন গীতে করায় প্রভুর আনন্দ॥
ঐ, মধ্যলীলা—দশম পরিচ্ছেদ।
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীত গোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ॥
ঐ, অন্ত্যলীলা—সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

না করিলে অন্যে বুঝাইয়া দিতে পারে না। তাঁহার পদাবলীতে এমন কি একটা ঐশী আকর্ষণী শক্তি নিহিত আছে যে, একবার কর্ণে প্রবেশ করিলে মন ভুলিয়া যায়, প্রাণ সুশীতল হয়, হৃদয়ে কি জানি কি এক অব্যক্ত প্রীতির উদয় হয়। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাঁহার পদাবলী সমালোচনার সময় আমরা এ বিষয় আরো বিশদ করিবার চেষ্টা করিব।

ভারতবর্ষ ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের দৃশ্যস্থল, ভারত-সন্তান ভাগ্য-নিগ্রহের দৃষ্টান্ত স্থল। হিন্দুর সুখ-সৌভাগ্য পূর্ব্বে কিরূপ ছিল, আর আজি বা কিরূপ?—যেন স্বর্গ ও রসাতল! হিন্দুর অদৃষ্টনেমি ঘুরিতে ঘুরিতে সে সৌভাগ্যকে রসাতলে নিমজ্জিত করিয়াছে, এখন আর তাহার আবর্ত্তন শক্তি নাই,—ঊর্দ্ধে উঠা পরের কথা। কিন্তু বহু শতাব্দীর এ ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়াও, এ রোগ শোক দুঃখ দারিদ্র্য, বিপদ বিপত্তির মধ্য দিয়াও, এ পরপীড়ন-রুধিরাক্ত কলেবর ও ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন শ্মশান-ভূমির মধ্য দিয়াও, সেই আর্য্য-হৃদয় প্রবাহিত হইতেছে; হিন্দুর আদি কবি প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া বেদগান করিয়া গিয়াছেন, হিন্দুসন্তান পূর্ব্বপুরুষের সকল হারাইয়া থাকিলেও, হিন্দুর মন সেই কবি-কল্পনা, সেই কাব্যানুরাগ হইতে

বিরত হয় নাই, হিন্দুর হৃদয়ে কবিত্ব-স্রোত এমরুর নিম্নস্তর বাহিয়া এখনো প্রবাহিত হইতেছে। হিন্দুস্তান বাহ্যিক জীবনের অগৌরব হইতে মুখ লুকাইবার জন্যই বুঝি, বাহ্যিক জীবনের গ্লানি ও যাতনা ভুলিবার জন্যই বোধ হয়, অন্তরাভিমুখে তাকাইয়া শান্তির স্থান অনুসন্ধান করিয়াছেন, করিতেছেন; তাই বাহিরে জড়ত্বপ্রাপ্ত হইলেও, অন্তঃস্রোত প্রবহমান রহিয়াছে। বালুকারাশির মধ্যে নৈরাশ্যের ছবি অঙ্কিত দেখিলেও ফল্‌গু যে অন্তঃসলিলা, হিন্দুসন্তানের, অন্ততঃ বঙ্গীয় যুবকের কাব্যানুরাগে, কবি-কল্পনায় তাহা প্রতীয়মান হইতেছে। হিন্দু সন্তানের আভ্যন্তরিন প্রবাহের বিরতি নাই, সংকীর্ণতা প্রাপ্ত হইলেও অনবরুদ্ধগতিতে চলিয়া আসিতেছে। এত অধঃপতনের মধ্যেও বাঙ্‌লাকাব্যের গতি ও উন্নতি আলোচনা করিলে প্রতীতি হইবে, হিন্দুর—বঙ্গসন্তানের জীবনালোক একবারে নিবিয়া যায় নাই। এই দেখিয়াই বোধ হয় সূক্ষ্মদর্শী বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,— "সাহিত্যালোচনাই, জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি সাধনই বাঙ্গালীর সভ্যজগতে গৌরব লাভের একমাত্র উপায়।"*

* উৎসাহ।

'বান্ধবে'র প্রবীন সমালোচক-প্রবর লিখিয়াছিলেন,—'লাভালাভ বিবেচনায় কবিতাকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা—অধম, মধ্যম ও উত্তম। যে কবিতায় মনুষ্য-সমাজের জ্ঞান, নীতি ও সুখ ব্যাহত হয়, তাহাকে অধমকবিতা বলা যাইতে পারে; যে কবিতায় মনুষ্যের জ্ঞান, নীতি বা সুখ এ তিনের একটীরও কিছু মাত্র হ্রাস বৃদ্ধি না হয়, তাহাকে মধ্যম কবিতা বলা যাইতে পারে। আর যে কবিতায় মনুষ্যের জ্ঞান, নীতি বা সুখ পরিপুষ্ট, পরিমার্জ্জিত বা পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহাকে উত্তম কবিতা এই আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।' যদি কবিতার এইরূপ শ্রেণী বিভাগ করিতে পারা যায়, তবে চণ্ডীদাসের কবিতা কোন্ শ্রেণীভুক্ত হইবে, তাহা পাঠকগণের বিচার্য্য। চণ্ডীদাসের পদাবলী সম্বন্ধে আরো পরে কিছু বলিব, সেই সময় পাঠকগণের রসাস্বাদনের অধিক অবসর হইবে। তবে এস্থানে ইহা বলিয়া রাখি যে, চণ্ডীদাস সর্ব্বাদিম ও সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ প্রাচীন কবি ও তাঁহার কবিতা প্রথম শ্রেণীর উপরেও যদি কোন শ্রেণী থাকে, তবে সেই শ্রেণীভুক্ত। তাঁহার ন্যায় সহজভাবের কবি আর নাই, চণ্ডীদাসের তুলনা কেবল চণ্ডীদাস।

ষষ্ঠ প্রস্তাব।

(কাব্য।)



১।—পদাবলী।

'বান্ধবে'র সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক-প্রবর কবিবর হেমচন্দ্রের 'দশমহাবিদ্যা'র সমালোচনার প্রারম্ভে বলিয়াছিলেন,—"আমার এক বাল্যসখা সমালোচনার অতি সহজ ও সুন্দর উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন—'মাইকেল নবম শ্রেণীর কবি', 'মণ্টগমরি সপ্তম শ্রেণীর কবি', 'ভারত চন্দ্র চতুর্থ শ্রেণীর কবি', 'বায়রণ ষষ্ঠ শ্রেণীর কবি'। এইরূপ যখনই আমার বাল্যবন্ধুকে কোন কবির কথা জিজ্ঞাসা করিতাম, তখনই আমার বন্ধু ভ্রূযুগল ঈষৎ আকুঞ্চিৎ করিয়া, নয়নদ্বয় কিঞ্চিৎ বিস্ফারিত করিয়া, নাসারন্ধ্র কিঞ্চিৎ বিস্তারিত করিয়া, বদন মণ্ডলে পাণ্ডিত্যের ও গাম্ভীর্য্যের অলৌকিক চিন্তা প্রকটিত করিয়া বলিতেন, 'এই কবি দ্বাদশ শ্রেণীর বা ত্রয়োদশ শ্রেণীর'। এইরূপ সমালোচনায় সকল পক্ষেই বিশেষ সুবিধা হইত। সমালোচক এক কথায়, তাঁহার কার্য্য সম্পাদিত করিতেন, কবির সম্বন্ধে আমারও বিশেষ

জ্ঞান লাভ হইত এবং কবির প্রতিও কিছুমাত্র অন্যায় প্রদর্শন করা হইত না। ইয়ুরোপে ইহা অপেক্ষাও সমালোচনার আর এক সুন্দর ও সহজ উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সমালোচক বলিতেন,— 'কবির বিদ্যা ৫, কবির কল্পনা ৪, কবির ভাষা ৩, কবির বর্ণনাশক্তি ৫।' এক কথায় পাঠক, সমালোচক ও গ্রন্থকার সকলেই পর্য্যাপ্তরূপে তৃপ্তিলাভ করিতেন।" দুর্ভাগ্য বশতঃ আমরা এরূপ কবি-সমালোচনার নিতান্ত অক্ষম। আমরা প্রথমতঃ কবির পদাবলীই সমালোচনা করিব। তৎপর তাহা দেখিয়া যদি আমরা বুঝিতে পারি প্রাচীন বৈষ্ণব-সাহিত্যে চণ্ডীদাসের স্থান কত উচ্চে, তবে না হয় তাঁহার একটী স্থান নির্ণয় করিব। বান্ধবের সমালোচক মহাশয় যেমন কবির সমালোচনা না করিয়া কবির দশমহাবিদ্যারই সমালোচনা করিয়াছেন, এস্থলে আমরা সেরূপ করিতে পারিলাম না। আমরা কবির পদাবলী সমালোচনা করিয়া প্রাচীন সাহিত্যে তাঁহাকে একটী স্থান দিতে নিতান্ত উৎকণ্ঠিত। এবং সে স্থান যে কত উচ্চে বা কত নিম্নে হইবে, তাহার আভাষ পাঠক ইতিপূর্ব্বেই পাইয়াছেন।

আমি বাল্যকাল হইতেই চণ্ডীদাসের ভক্ত—তাঁহার নিতান্ত অনুরক্ত। সেই সময় হইতেই কবির পদ-সুরভিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পদে প্রেম-পুষ্পাঞ্জলি দিয়া আসিতেছি। সুতরাং আমার দ্বারা তাঁহার পদাবলীর সঙ্গত সমালোচনা না

হইলেও, অবস্থা বিবেচনায় আমার ত্রুটী মার্জ্জনা করিতে পাঠকগণ কুণ্ঠিত হইবেন না।

চণ্ডীদাসের ভাব-সম্মিলনের প্রশংসা করিবার শব্দ অভিধানে নাই, বলিবার শক্তিরও ততোধিক অভাব। বস্তুতঃ তাহাতে প্রেমের যে সুগভীর মন্ত্র নিহিত আছে, তাহা অন্য কোন বৈষ্ণব কবির পদাবলীতে নাই, অন্য কোন প্রেমপুস্তকে নাই, এমন কি অনেক ধর্ম্মগ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায় না।

বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে, জনমে জনমে, প্রাণনাথ হৈয় তুমি॥
তোমার চরণে, আমার পরাণে, বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
জাতি কুলশীল, সকল মজাঞা, হইনু তোমার দাসী॥
ভাবিয়াছিলাম, এ তিন ভুবনে, আর মোর কেহ আছে ?
রাধা বলি কেহ, সুধাইতে নাই, দাঁড়াব কাহার কাছে ?
একুলে ওকুলে, দুকুলে গোকুলে, আপনা বলিব কায় ?
শীতল জানিয়া, শরণ লইনু, ও দুটী কমল পায়॥
অবলা অখলে, নাঠেল চরণে, ত্রুটীর নাহিক ওর।
ভাবিয়া দেখিনু, প্রাণনাথ বিনে, গতি যে নাহিক আর॥
আঁখির নিমিখে, যদি নাহি দেখি, তবে যে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে, পরশরতন, গলায় গাঁথিয়া পরি॥

কি বিহ্বলতা ! কি একান্ত নির্ভরতা !!

'চণ্ডীদাসের ভাব-সম্মিলনের পদাবলী স্তোত্ররূপে পাঠ করা যায় ; ততোধিক প্রশংসা করিলেও বোধ হয় অন্যায় হইবে না। সে গুলির মত প্রেমের সুগভীর মন্ত্র ধর্ম্মপুস্তকেও

বিরল। 'বঁধু কি আর বলিব আমি'—প্রভৃতি গান শুধু বৈষ্ণবের কণ্ঠে নহে, ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া সুশ্রাব্য মনোহর-সাহী রাগিণীতে ব্রাহ্ম গায়কের কণ্ঠেও ধ্বনিত হইয়া থাকে।" (১)।

শত বর্ষ পর রাধিকা বঁধুয়া পাইয়াছেন। লোকে হারা নিধি পাইলে যেমন হৃদয়ে তুলিয়া লয়, অন্যত্রে রাখিতে অবকাশ পায় না, রাধিকাও তেমনি বঁধুকে পাইয়া উল্লাসিত হইলেন, উভয়ে—দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হইলেন।

রসভরে দুহুঁ তনু, থর থর কাঁপই, ঝাঁপই দুঁহু দোঁহা আবেশে ভোর।
দুহুঁক মিলনে আজি, নিভাওল আনল, পাওল বিরহক ওর॥

মিলনে উভয়ের শতবর্ষব্যাপী বিরহানল নির্ব্বাপিত হইল, বিরহের অবসান হইল। রত্নপালঙ্কে দুইজনে বসিয়া অতীত কালের সুদীর্ঘ ইতিহাস বলিতে আরম্ভ করিলেন। রাধিকা বলিলেন,—

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ!
দেহ মন আদি, তোমারে সঁপেছি, কুল শীল জাতি মান॥
অখিলের নাথ, তুমি হে কালিয়া, যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী, হাম অতি হীনা, না জানি ভজন পূজন॥
পিরীতি রসেতে, ঢালি তনু মন, দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি, তুমি মোর গতি, মন নাহি আনভায়॥
কলঙ্কী বলিয়া, ডাকে সব লোকে, তাহাতে নাহিক দুখ।
বঁধু তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার, গলায় পরিতে সুখ॥

(১) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত, ভালমন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস, পাপ পুণ্যময়, তোমার চরণ খানি॥

তুমিই আমার সব, আমি তোমাকেই স্মরণ করিয়া এই সুদীর্ঘ-কাল যাপন করিয়াছি। লোকে কত নিন্দা করিতেছে, 'শ্যাম কলঙ্কিনী' বলিয়া কত উপহাস করিতেছে কিন্তু তাহাতে আমার দুঃখ নাই; তোমাকে পাইলে আমি সে কলঙ্ক হেম হারের ন্যায় গলায় পরিতে পারি। আমি ভালমন্দ কিছুই জানি না, পাপমন্দ বিচার করি না,—কেবল তোমার চরণ খানিই সার। তুমি এজন্মে আমাকে যত কষ্ট দিলে, ইচ্ছা হয় যদি পর জন্মে আমি শ্রীনন্দের নন্দন হই, আর তুমি রাধা হও। তখন জানিবে সখা, পিরীতি কেমন জ্বালা।'

বঁধু কি আর বলিব তোরে।
অলপ বয়সে, পিরীতি করিয়া রহিতে না দিলি ঘরে॥
কামনা করিয়া, সাগরে মরিব, সাধিব মনেরি সাধা।
মরিয়া হইব, শ্রীনন্দের নন্দন, তোমারে করিব রাধা॥
পিরীতি করিয়া, ছাড়িয়া যাইব, রহিব কদম্বতলে।
ত্রিভঙ্গ হইয়া, মুরলী বাজাব, যখন যাইবে জলে॥
মুরলী শুনিয়া, মোহিত হইবা, সহজ কুলের বালা।
চণ্ডীদাস কয়, তখনি জানিবে, পিরীতি কেমন জ্বালা॥

কিন্তু এত আত্ম-নির্ভরতা, এত প্রেম-বিহ্বলতা, এত তন্ময়তা সত্ত্বেও বুঝি এই শতবৎসরের অদর্শনে রাধিকার বঁধুর উপর একটু অবিশ্বাস হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া মথুরায় যাইয়া রাজাসন গ্রহণ করিয়াছেন। তখন বসন্তকাল

—রাধিকার বিরহ দশা। রাধিকার দিন আর যায় না। সখীগণকে ধরিয়া কেবলি কাঁদেন,——

কালি বলি কালা, গেল মধুপুরে, সে কালের কত বাকি।
যৌবন সায়রে, সরিতেছে, ভাঁটা, তাহারে কেমনে রাখি॥
জোয়ারের পাণী, নারীর যৌবন, গেলে না ফিরিবে আর।
জীবন থাকিলে, বঁধুরে পাইব, যৌবন মিলন ভার॥

× × × ×

আমার মাথার কেশ, সুচারু অঙ্গের বেশ, পিয়া যদি মথুরা রহল।
ইহ নব যৌবন, পরশ রতন ধন, কাচের সমান গেল॥

রাধিকার বড় দুঃখ হইয়াছে:—জীবন থাকিলে একদিন না এক দিন বঁধুকে পাইব কিন্তু যৌবন চলিয়া গেলেত আর ফিরিয়া আসিবে না। আমার এ নব যৌবন-সাগরে যে ভাটা লাগিয়াছে, তাহার গতিরোধ কি করিয়া করা যায়? যদি এই মধুর বসন্তকালে, কোকিল-কূজন-মুখরিত কেলিকুঞ্জে পিয়ার সহিত মিলিত হইতেই না পাইলাম, তবে এ সুচারু অঙ্গের বেশে, এ চিকুরকুন্তলদামে, এ মনোমোহন বেণীবন্ধনে, এ নব যৌবনে কায কি?

কোন্ সে নগরে, নাগর বহল, নাগরী পাইয়া ভোর।
কোন্ গুণবতী, গুণেতে বেঁধেছে, লুবধ ভ্রমর মোর॥

বহুকাল কৃষ্ণের দর্শন না পাওয়ায় রাধিকার মনে একটা সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে বুঝি বঁধু আমার অন্য কোন নাগরীর প্রেম-পাথারে নিমগ্ন হইয়াছে, বুঝি অন্য কোন গুণবতী আমার 'লুবধ ভ্রমর'কে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

চণ্ডীদাস এইস্থানে রাধিকাকে সাধারণের চক্ষে একটু খাটো করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন! শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এইরূপ অবিশ্বাস এবং যৌবন-সায়রে ভাটা লাগায় এইরূপ হা হুতাশ কৃষ্ণগতপ্রাণা রাধিকার উপযুক্ত হয় নাই। রাধিকার এই আক্ষেপ-উক্তির ছত্রে ছত্রে পাশব-প্রবৃত্তির তীব্র উচ্ছ্বাস ক্ষরিত হইতেছে। প্রেমিকের হৃদয় সর্ব্বদা ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকে, আত্ম-নিগ্রহেই তাহার আনন্দ হয়। ভোগ ও ত্যাগ, আত্ম-সমর্পণ ও আত্ম-তৃপ্তি, ব্যাপ্তি ও পূর্ণতা—সকলি এক প্রেমে সংশোধিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ অরণ্যচারিণী অর্দ্ধচীর বাস-ধারিণী রাজনন্দিনী দময়ন্তীর কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। দময়ন্তীর মতন আর কয়জন ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন?

চণ্ডীদাস রাধিকাকে উন্মাদিনী করিয়া সাজাইয়াছেন। প্রেমই তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব; তিনি প্রেম পাওয়ার জন্য তত ব্যাকুলা নহেন, যতটা দিবার জন্য ব্যাকুলা। তিনি প্রাণ বঁধুকে বুকের ভিতর ধরিয়া, সমস্ত হৃদয়ের প্রেম-সুধা ঢালিয়া সুখী হইতে চাহেন। ইহার ব্যতিক্রম হইলেই তাঁহার জ্ঞান থাকে না, তিনি ধৈর্য্য হারা হন; তখনই ভাবেন—'শিশু-কালে মরি গেলে হইত যে ভালা।' তাহা হইলে আর এখন এই পাপ পিরীতের জ্বালা সহ্য করিতে হইত না, তাহা হইলে আর——

সাগর শুকাল, মাণিক লুকাল, অভাগীর করম দোষে!

আমার করম দোষে, সাগর শুষ্ক হইত না, মাণিকও লুকাইত না। তৃষ্ণার বারিতে বজ্রপাত হইতেও দেখিতাম না।—

পিয়াস লাগিয়া, জলদ সেবিনু, বজর পড়িয়া গেল ॥

তাহার পরই প্রেমের বিহ্বলতা;—নিজকে কৃষ্ণের অধীনা করিয়া আত্মার স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হরণ করতঃ কত বিনয়, কত স্তুতি, কত মধুমাখা ক্রোধ।

জনম অবধি, কালিয়া বদন, না ধুলি লাজের ঘাটে হে।
ব্রজ গোপীদে' হ'তে, মথুরা নাগরী, কতরূপে গুণে বটে হে॥
কিম্বা কুবুজা, নামে কুবুজনী, তোঁএ সে লেগেছে মনে।
আপনি যেমন, ত্রিভঙ্গ মুরারী, বিহি মিলায়েছে জেনে॥

এই ক্রোধের পর মান,—

যতেক তোমারে, পিরীতি করুক, তেমন পিরীতি হ'বে না।
রাধানাথ বিনে, কুবজার নাথ, কেহ ত তোমারে কবে না॥

তারপরই অশ্রু বরিষণ,—

কি আর কহিব, মনের বেদন, কহিতে যে দুখ পাই।
চণ্ডীদাস কহে, কহিতে বেদনা, পরাণ ফাটিয়া যায়॥

এই অশ্রু সম্পাত, দুঃখ নিবেদনের পর—সম্ভোগ-মিলন।

চণ্ডীদাস শ্যাম-বিরহিনী, অচিন্ত্য-তত্ত্বরূপিনী, ব্রজকাব্য-বিলাসিনী, উন্মাদিনী রাধিকাকে শ্যাম-বিরহে সন্তাপিত করিয়া কখনো নয়নজলে ভাসাইয়াছেন, কখনো নবজলধরের মাধুর্য্য দর্শাইয়া তাঁহার হৃদয়ে মহামোহকরভাব জন্মাইয়াছেন; আবার কখনো নবদুর্ব্বাদল শ্যামের অপরূপ রূপের ঝলকে বিমোহিত করিয়া 'মরি কি পেখনু' বলিয়া দেখিবার অতৃপ্ত পিপাসায়

অস্থির করিয়াছেন, আর সেই সঙ্গে প্রেমোন্মাদিনী রাধিকার মনের কথা বলিতে গিয়া আমাদিগকে কাঁদাইয়াছেন। এমন পাষাণ হৃদয় কাহারো নাই যে, আত্ম-বিস্মৃতা রাধিকার মনের কথা শুনিয়া ক্ষণকালের তরেও অশ্রু বর্ষণ না করে।

আমরা আর দুইটী পদ উদ্ধৃত করিব। চণ্ডীদাসের সমস্ত কবিতাগুলিই মধুময়। প্রেমিক পাঠক নিজে আস্বাদ না করিলে, পরের মুখে আস্বাদ করিয়া রসানুভব করিতে পারিবেন না।

রাধিকা সখী সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম ?
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ ॥
না জানি কতেক মধু, শ্যামনামে আছে গো, বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো, কেমনে পাইব সই তারে ॥
নাম পরতাপে যার, ঐছন করিল গো, অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার, নয়নে দেখিয়া গো, যুবতী ধরম কৈছে রয় ॥
পাসরিতে করি মনে, পাসরা না যায় গো, কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে, কুলবতী কুলনাশে, আপনার যৌবন যাচায় ॥

এই পদটী পূর্ব্ব রাগের। কৃষ্ণের গুণ শ্রবণে রাধিকার মনমুগ্ধ হইলে তিনি সখীকে ধরিয়া বলিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ইহার এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন ;—

Friend ! ah ! who hath named that name ?
Through my ear it steals,
My heart it thrills,
My life and soul it doth inflame !

Ah who shall tell
What sweet doth dwell
In that beloved strain!
I name that name,
My soul all flame!
Oh! will he come again?

অনুবাদটী যে যথাযথ হয় নাই তাহা পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন, দত্তজ মহাশয়ও তাহা নিজে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন,—

'Injustice to the poet we are bound to confess, that we have spoilt the poem in translating, for the feeling in the original is so deep, so intense that no translation probably can adequately express it in English What we would point out to our readers, however, is the total want of figures or similes, a total ignoring as it were of all attempts of ornamentation. The poet strongly feels his subject and records it pathetically without any embellishment, without any attempts of adornment.'

কি বুকে দারুণ ব্যথা!
সে দেশে যাইব, যে দেশে না শুনিব, পাপ পিরীতের কথা॥
সই কে বলে পিরীতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে, পিরীতি করিয়া, কান্দিতে জনম গেল॥
কুলবতী হইয়া, কুলে দাঁড়াইয়া, যে ধনী পিরীতি করে।
তুষের অনল, যেন সাজাইয়া, এমনি পুড়িয়া মরে॥
হায় অভাগিনী, এ দুখে দুখিনী, প্রেমে ছল ছল আঁখি।
চণ্ডীদাস কহে, যেমতি হইল, পরাণে সংশয় দেখি॥

এটী রাধিকার বিরহকালিন কাতরোক্তি। দত্ত মহাশয়ের অনুবাদ—

A cruel throb is in my heart !
I'll leave my home,
And thither roam,
Where never's known love's fatal art.
I loved and smiled,
My hearts beguiled,
And what is left but life-long weeping ?
For love should e'er a damsel sigh,
O ! spare her shame,
In fire and flame,
A kinder death, O ! let her die !
O ! I have felt this bitter grief
My eye-balls shine,
With ceaseless brine,
Says Chandidas, O ! for her life !

আমরা চতুর্থ প্রস্তাবে বলিয়াছি, চণ্ডীদাসের ভাব-সম্মিলন, অনুরাগ, বিরহ প্রভৃতিতে যে সৌন্দর্য্য ও কমনীয়তা আছে, বিদ্যাপতিতে তাহা নাই।

দত্ত মহাশয় বলেন,—"Seldom doth Bidyapati manifest such deep feeling any pathos. His strong point lies, as we have already pointed out, in fine imaginary and embellishment. Even while describing scenes of sadness and woe Bidyapati relieson his vivid fancy, and seldom approaches Chandidas in intensity of feeling,"

চণ্ডীদাস ভাবুক, বিদ্যাপতি কবি। চণ্ডীদাসের কবিতার বহিঃ সৌন্দর্য্য,—সাজ-সজ্জা কিছুই নাই, কেবল স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যই তাহার একমাত্র বেশভূষা, বিদ্যাপতির পদাবলী বাহ্যিক অলঙ্কার ও শব্দাড়ম্বরে বিচিত্রভাবে সজ্জিত—পাঠে হৃদয় উদ্বেলিত হয় কিন্তু ততটা দ্রবীভূত হয় না। চণ্ডীদাসের ন্যায় বিদ্যাপতিও প্রতি কথায় প্রেমের গান গাহিয়াছেন,—যে প্রেম, সৌন্দর্য্যের অনুভূতিতে প্রথম অঙ্কুরিত হইয়া প্রাণে অতি দুঃসহ লালসায় পরিবর্ত্তিত হয়, তাদৃশ প্রেম-চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। বিদ্যাপতি কোথাও রাধার ভাবে প্রেমের অর্চ্চনা করিয়া, প্রেম-ভক্তির অশ্রুনির্ম্মাল্য বর্ষণ করেন নাই। তিনি কেবল আমাদের হৃদয়ে ভাবের তরঙ্গ তুলিয়াছেন।

২।—অন্যান্য রচনা।

১। শ্রীরাধার কলঙ্ক ভঞ্জন। এই গ্রন্থখানি সম্প্রতি শ্রীযুক্ত আবদুল করিম মহাশয় আবিষ্কার করিয়াছেন কিন্তু এপর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই। গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ, মোট পত্র সংখ্যা ১১ কিন্তু প্রথম তিন পৃষ্ঠা বিলুপ্ত। ক্ষুদ্র পুস্তক, অতি কদর্য্য হস্তলিপি। অনেক স্থলে পাঠ অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়।

অনেকেই বলেন, চণ্ডীদাস যে কেবল কতকগুলি সম্বন্ধ-বিহীন পদাবলী রচনা করিয়াই কবি-জীবন শেষ করিয়াছেন তাহা নহে, তিনি ধারাবাহিকরূপে কৃষ্ণচরিত বর্ণন করিয়াছেন।

বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে চণ্ডীদাসের যে সকল অপ্রকাশিত পদাবলীর উদ্ধার হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে এই উক্তি যথার্থ বলিয়া অনুমিত হয়। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় রাসলীলা বিষয়ক অনেক গুলি পদ প্রকাশিত হইয়াছে; তাহাতে কৃষ্ণচরিত বর্ণিত হইয়াছে। ইহার বিষয় পরে বলিব, আগে 'শ্রীরাধার কলঙ্ক ভঞ্জন' সম্বন্ধে আমার বক্তব্য শেষ করি।

আবদুল করিম মহাশয় বলেন,—'শ্রীরাধার কলঙ্ক ভঞ্জনার্থ শ্রীকৃষ্ণের কপট মূর্চ্ছার অপনয়ন গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। অতি সহজ বিষয়, সকলেই জানেন। আমার প্রকাশিত 'রাধিকার মানভঞ্জনে' যে ছন্দ, এই গ্রন্থেও সেই ছন্দ, স্থানে স্থানে সামান্য ইতর বিশেষ মাত্র। আবার বাসুদেব ঘোষের 'গৌরাংচরিত' বা 'গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস পটি'তেও এইরূপ ছন্দ দেখিতেছি। চণ্ডীদাসের রচনার মত সহজ রচনা বঙ্গ-সাহিত্যে বিরল। সমালোচ্য গ্রন্থেরও একটা অলঙ্কার—সহজ রচনা। নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে সে কথা সহজে সমর্থিত হইবে।"

রাণী বলে বৈদ্যরাজ আমি ত না চিনি।
কি ঔষধে ভাল হয় আমার নীলমণি ॥ ধু।
রাণী বলে বৈদ্যরাজ নাম ধর।
নীলমণিকে রক্ষা কর ॥
বৈদ্য বলে নন্দ রাণী কহি তোমার ঠাঁই।
কত ধন দিবা রাণী তাহা শোন চাই ॥°
রাণী বোলে নন্দপুরে জন্ম রত্নমণি।
সকল দিলাম আমি যাদব নিছনি ॥

এই সব ধন জদি মনে নাহি ধরে।
দাসী করা নিয়া যাও নন্দ যশোদারে॥
আঞ্চল পাড়িল আমি।
বাছা ভিক্ষা দেহ তুমি॥

আরো একটু দেখুন.—

রাধে বোলে কলঙ্কিনী হইয়াছি আমি
সব লোকের ঠাঁই।
কেমনে আনিব জল যমুনাতে যাই॥ ধু।
নিবেদি তোমার ঠাঁই।
আমার সমান কলঙ্কিনী নাই॥
মনের দুঃখ নিবারিতে যাই যার ঘরে।
শ্যাম কলঙ্কিনী বলি খোটা সেহি মারে॥ ধু।
দুঃখ নিবেদতে যাই।
বোলে আইল কলঙ্কিনী রাই॥
তৃষাযুক্ত হৈয়া যামি যার ঠাঁই খুঁজি পানি।
সেহ বোলে ঐ আইল রাধা কলঙ্কিনী॥
যশোদাএ বোলে রাধা শুনহ বচন।
জল আনি রক্ষা কর কানাইর জীবন॥
তুমি বহি কে মোর যাছে।
কৈব দুঃখ কার কাছে॥

এখন আমরা বলিতে পারি, এরূপ সহজ রচনা, এরূপ সরল কল্পনা চণ্ডীদাসের লেখনীরই উপযুক্ত। 'চণ্ডীদাস' গ্রন্থেরও সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, 'যদিও চণ্ডীদাসের কোন পৃথক গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি তাঁহার রচিত কোন গ্রন্থ

ছিল, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে।' এপর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় একাধিক চণ্ডীদাস কবির আবির্ভাব জানা যায় নাই, ইহাও এ গ্রন্থকে চণ্ডীদাসের রচিত বলিবার পক্ষে একটা যুক্তি বটে।*

শ্রীরাধার কলঙ্ক ভঞ্জনের ভণিতি এইরূপ,—

(২) চণ্ডীদাসে বোলে সার।
কৃষ্ণগতি সভাকার॥

(১) যশোদায় দিল কৃষ্ণ শ্রীদামের কোলে।
রাধা কৃষ্ণ পানে চাহিয়া চণ্ডীদাস বোলে॥

গ্রন্থখানির উপসংহার এইরূপ ;—

রাণী বোলে রগো রাধে নেয় গোবিন্দেরে।
তোমার ঘরেতে রহলে দেখিতাম তাহারে॥
তোমার অধীন কৃষ্ণ দৈবে সে হইয়াছে।
দাস তুল্য হৈয়াছে তাহা কি নিয়া লৈয়াছে॥ ধু।
যদি তোমার দয়া থাকে।
পুত্র দান দেয় মোকে॥
শুনিয়া রাণীর বাণী,
কহে রাধে সুবদনী,
লৈয়া যাও তোমার গো নন্দন।
কৃষ্ণচন্দ্রের মুখ দেখি,
রাধার অন্তরে সুখী ;
করিলেক চরণ বন্দন॥
শ্যামের বামে দাঁড়াইল,
দুই হরষিত হইল ;
দুই প্রেমে হরসিত হৈল সর্ব্বজন॥ ধু।

*সাহিত-পরিষৎ-পত্রিকা, ১ম ভাগ।

শ্রীরাধে গোবিন্দ পাইল,
ভক্তের আনন্দ হইল।
সবে হরি হরি বোল,
শ্রীরাধে গোবিন্দ পাইল॥

'ইতি শ্রীরাধার কলঙ্ক ভঞ্জন সমাপ্ত। ইতি সন ১১৮২ সহী তারিখ মাহে ১৮ ফাল্গুন রোজ বুধবার বৈকাল বেলা। এই বৈইর মালিক শ্রীকাশীনাথ দেয় দাস পীচরে রামমোহন চৌধুরী।' একখানি সম্পূর্ণ হস্তলিপি সংগ্রহ করিয়া প্রাচীন কবির এই অক্ষয় কীর্ত্তি রক্ষা করিতে পারিলে সুখের বিষয় হইবে।

৩। কৃষ্ণ চরিত। উইলসন সাহেব লিখিয়াছেন যে, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দ দাস উভয়ে 'কৃষ্ণ কীর্ত্তন' প্রণয়ণ করিয়াছেন। চণ্ডীদাস ও গোবিন্দ দাস একত্রে কৃষ্ণ কীর্ত্তন প্রণয়ণ করা অসম্ভব, কারণ তাঁহারা সমসাময়িক ছিলেন না। বৈষ্ণব-সাহিত্যে একাধিক গোবিন্দ দাসের অস্তিত্বের বিষয় অবগত হওয়া যায়,—আমরা গোবিন্দ নাম ধারী এগার জন বিভিন্ন বৈষ্ণব কবির বিষয় জানিতে পারিয়াছি। (১) কিন্তু

১। (১) ঝামটপুর নিবাসী গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী; (২) বোরাকুলী নিবাসী গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, (৩) কাশীশ্বর ব্রহ্মচারীর শিষ্য উৎকলবাসী গোবিন্দ দাস; (৪) মহাপ্রভুর প্রধান ভৃত্য গোবিন্দ দাস; (৫) গোবিন্দ দাসের কড়চা লেখক কর্ম্মকার জাতীয় গোবিন্দ দাস, (৬) গোবিন্দ আচার্য্য; (৭) কীর্ত্তনীয়া

তাঁহাদের কেহ যে চণ্ডীদাসের সমসাময়িক ছিলেন তাহার কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হই নাই। পুরাতন 'বান্ধবে' 'গোবিন্দ দাস' ইতি শীর্ষক একটি প্রস্তাবে দেখান হইয়াছে যে, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দ দাস সমসাময়িক কিন্তু লেখকের যুক্তি সর্ব্বাংশে গ্রাহ্যণীয় নহে। 'কৃষ্ণ কীর্ত্তন' পুস্তক প্রণীত হইতে পারে, পারে কেন খুব সম্ভব হইয়াছিল কিন্তু উইলসন সাহেবের সহিত এক যোগে বলিতে প্রস্তুত নহি যে, তাহার প্রণেতা চণ্ডীদাস ও গোবিন্দ দাস। আমি কবিযশঃ কেবল চণ্ডীদাসের মস্তকেই বর্ষণ করিতে সম্পূর্ণ ইচ্ছুক।

'সোম প্রকাশে'র পত্র প্রেরক লিখিয়াছিলেন যে, চণ্ডীদাসের পুস্তকের নাম 'গীত চিন্তামণি'। একথাও বিশ্বাস করিতে সহসা প্রবৃত্তি হয় না। কারণ গীত চিন্তামণির কথা কাহারো মুখে শুনা যায় না। যাহা হৌক্ চণ্ডীদাসের পুস্তকের নাম গীত চিন্তামণিই হউক বা কৃষ্ণ কীর্ত্তনই হউক, তিনি যে ধারা বাহিক রূপে কৃষ্ণচরিত বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

গোবিন্দ দত্ত; (৮) বাঘনাপাড়া নিবাসী গোবিন্দানন্দ; (৯) গোবিন্দ কবিরাজ; (১০) গোবিন্দ ঘোষ; (১১) বুধরী গ্রামবাসী রামচন্দ্র কবিরাজের ভ্রাতা গোবিন্দ কবিরাজ। এতদ্ব্যতীত গতিগোবিন্দ নামক আর একজন পদ কর্ত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি শ্রীনিবাসাচার্য্যের পুত্র ছিলেন।

আমরা নিম্নে কৃষ্ণচরিত হইতে একটী পদ উদ্ধৃত করিলাম।——

সখি, কহিও তাহার পাশে।
যাহারে ছুইলে, সিনান করিয়ে, সে মোর দেখিয়ে হাঁসে॥
কর শিরে হাত দিয়া।
কদম্ব তলেতে, কি কথা কহিলে, যমুনার জল ছুঁয়া॥
মোর বৃন্দাবন আছে সখি।
আর এক হয়, যদি মনে লয়, কপোত নামেতে পাখী॥
একথা কহিও তারে।
যে গুণ ঝুরিয়া, যে জন মরিবে, সে বধ লাগিবে তারে॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে।
যাহার লাগিয়ে, যে জন মরয়ে, সেতারে পাসরে কেনে॥

চণ্ডীদাস মানব চরিত্র কেমন বুঝিয়াছিলেন, পাঠকগণ তাহার নমুনা দেখুন ;——

ধরনী উপরে পরিবে চারি।
তবে সে চিনিবে সুগন্ধ বারি॥
রাঙ্গ রূপা চিনিবে গায়।
কুটিল চিনিবে কোন উপায়॥
আগেতে কহে মধুর বাণী।
পরের হৃদয় পাতিয়া আনি॥
আপন আশা পরকে দেই।
চণ্ডীদাস কহে কুটিল সেই॥

কৃষ্ণচরিতে কবি অদ্ভুত কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, এবং রাধাশ্যামকে লইয়া প্রেমের নানা প্রকার ভাব দেখাইয়াছেন। কবি দেখাইয়াছেন যে, প্রাণটা সর্ব্বদা নিঃস্বার্থ প্রীতির দর-

দরিত ধারায় ঢালিয়া দিয়া পৃথিবীর প্রাণ সুশীতল করিলে পৃথিবীর সকলেই তোমার হইবে, আর যাহাকে একবার প্রাণ দিয়া ভাল বাসিবে, সে জীবনে মরণে তোমারই হইয়া থাকিবে। কৃষ্ণচরিতে কবি স্বীয় নায়ককে, কখন নাপিতানী, কখন দেয়াশিনী, কখন বৈদ্য বেশে সাজাইয়া উৎকৃষ্ট নাটকাভিনায়কের কৃতিত্ব দেখাইতে সক্ষম হইয়াছেন। নায়কের এবেশো তরল রসে ভরপুর।

৪। রাসলীলা। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় চণ্ডীদাসের রাসলীলা বিষয়ক অনেকগুলি পদ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা বর্ণিত হইয়াছে। চণ্ডীদাসের রাসলীলা ভাগবতের অবিকল অনুবাদ না হইলেও, সেই ভাব লইয়া রচিত। ভাবানুযায়ী রচিত হইলেও, যে গুণের জন্য চণ্ডীদাস অপরাপর বৈষ্ণব কবি হইতে শ্রেষ্ঠ আসন পাইয়া থাকেন, যে সহজ ভাবের জন্য তিনি বালক বৃদ্ধ, যুবক যুবতী সকলের হৃদয়ই অধিকার করিতে পারিয়াছেন, সেই অতুলনীয় মনোমুগ্ধকারিণী স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য, সেই প্রেমের সুগভীর মন্ত্র তাহার প্রতি কবিতাতেই নিহিত আছে। অনেকে বলেন যে, চণ্ডীদাস সংস্কৃত জানিতেন না। উক্ত মতাবলম্বীদিগকে আমরা তাঁহার রচিত কৃষ্ণচরিত ও রাসলীলা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ইহার স্থানে স্থানে কবি ভাগবতের সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন! দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা রাসলীলা হইতে একটী স্থান উদ্ধৃত করিতেছি। রাস-অভিসারের নিমিত্ত

শ্রীকৃষ্ণ কেলি-কুঞ্জে যাইয়া বংশীধ্বনি করিলেন, সেই ধ্বনী মলয়-সমীরণে সঞ্চালিত হইয়া গোপ-বধূ-কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। গোপিনীগণ তখন,——

কেহ বা আছিল, শিশু কোলে করি, পিয়াইতে আছিল স্তন।
দুগ্ধ পোষ্য বালা, ভূমি ফেলি গেলা, ঐছন তাহার মন॥
চলিলা গমন, সেই বৃন্দাবন, কান্দিতে লাগিল শিশু।
তেমাতি চালল, সব পরিহরি, চেতনা নাহিক কিছু॥
কোন জন ছিল, পতির শয়নে, ঘুমে অচেতন হৈয়া।
হেন বেলে শুনি, মুরলীর ধ্বনি, উঠিল চেতনা পা(ই)য়া॥
বিচিত্র বসনে, মুখানি মুছিয়া, চপল পতিরে ত্যজি।
পতি কোল সেই, ত্যজিলা তখনি, চলন বনেতে সাজি॥
কোন গোপী ছিল, কোন আরম্ভণে, ত্যজিয়া তখনি চলে।
রসের আবেশে, কিছু নাহি জানে, কারে কিছু নাহি বলে॥
কোন জনাছিল, বেদনে দুঃখিত, অঙ্গেতে আছিল দোষ।
শুনি বংশী গীত, অঙ্গ পুলকিত, সব দূরে গেল শেষ॥
চণ্ডীদাস বলে, কিবাসে দেখল, অপার অখল রামা।
তেইসে প্রেমেকে বন্ধন সবাই, গোপের রমণী জনা॥

পাঠক এই অংশ টুকু ভাগবতের রাসলীলার সহিত মিলাইয়া দেখুন, কবির অনুবাদ কিরূপ হইয়াছে।

রাসলীলা ব্যতীত চণ্ডীদাসের আরো কতকগুলি 'চতুর্দ্দশ পদাবলী' আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার কোন কোন অংশ আমরা, দ্বিতীয় প্রস্তাবে উদ্ধৃত—করিয়াছি।

অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন কৃষ্ণচৈতন্য নিমাই সন্ন্যাসী অবতীর্ণ হইবার প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে চণ্ডীদাসের সংগীত লহরী গৌড়

জনের চিত্ত-ক্ষেত্রে কৃষ্ণপ্রেম বারি সিঞ্চন করিয়াছিল, কৃষ্ণচৈতন্য স্বয়ং সেই কৃষ্ণপ্রেমপূর্ণ সঙ্গীত-সুধা পান করিয়া আনন্দে অধীর হইয়াছিলেন। যে সুধামাখা সঙ্গীতের তালে তালে তাঁহার মন প্রাণ নৃত্য করিত, সে সংগীতের অর্থ কি? এই সকল প্রশ্নের সঙ্গত অর্থ পাইতে ইচ্ছা করিলে, বঙ্গ সাহিত্যের প্রথমাবস্থা আলোচনা করিতে হয়। বঙ্গ-সাহিত্যের প্রথমাবস্থা, বৈষ্ণব-সাহিত্যের অন্তর্গত, সুতরাং বৈষ্ণব ধর্ম্মের আবির্ভাব, বিকাশ ও বিস্তৃতি বঙ্গবাসী মাত্রেরই আলোচনা যোগ্য। আলোচনা করিলে এমনি একটা তৃপ্তি অনুভূত হইবে, যাহা অন্য কোন সাহিত্যে মিলেনা। শৈশবের বিলুপ্ত প্রায় স্মৃতি জাল ভেদ করিলে যেমন স্নেহময়ী জননীর অপূর্ব্ব বাৎসল্যের প্রথম বিকাশ হৃদয়-দর্পণে প্রতিফলিত হয়, তেমনি বঙ্গসাহিত্যের প্রথমাবস্থা আলোচনা করিলে বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবিগণের মোহন সংগীতের অস্পষ্ট আলোক ভিন্ন আর কিছুই আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। আলোক-রশ্মি অস্পষ্ট হইলেও, চিত্র সুপরিস্ফুট না হইলেও কবিত্ব মনোহারী, প্রাণস্পর্শী; সঙ্গীতের সুরে সুরে হৃদয় মাতিয়া উঠে।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া যাহারা তাহাতে অপবিত্রতার আরোপ করেন; জঘন্য প্রণয় চিত্র ভাবিয়া যাহারা তৎপ্রতি কুটিল কটাক্ষপাত করিতে বিরত হন না, আমরা বলি তাহারা রসগ্রহণে-সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, তাহাদের নিকট বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করা—অরসিকেষু রসস্যনিবেদনং।

তাঁহাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন হৃদয়ে কখনো বৈষ্ণব কবির প্রেম ও ভক্তি প্রতিবিম্বিত হইতে পারে না।

সখিরে আজি কুদিন সুদিন ভেল।
মাধব মন্দিরে আওব ত্বরিতে, কপাল কহিয়ে গেল॥

শত বর্ষের বিরহখিন্ন জীবনের উপর সুধা বর্ষণ করিবার আজ এই মাহেন্দ্র যোগ সমুপস্থিত। কেহ বলে নাই, কেহ সংবাদ পাঠায় নাই, তথাপি রাধিকা জানিতে পারিলেন,—মাধব মন্দিরে আওব ত্বরিতে। ভক্ত ও প্রেমিক নিজে নিজেই আসন্ন সুখ দুঃখের সম্ভাবনা নিজহৃদয়ে অনুভব করিতে পারেন। তাই আজ কুদিন কাটিয়া গিয়াছে, সুদিনের সূত্রপাত রাধিকা জানিতে পারিলেন। তাঁহার কুদিন যে কাটিয়া গেল, তাহা কে বলিল? কৃষ্ণগত প্রাণা প্রেমিকা রাধিকা বলিলেন,—কপাল কহিয়ে গেল। কি বিচিত্র নির্ভরতা। অদৃষ্টের দুর্জ্ঞেয় সত্বা অনুভব করিয়া রাধিকার বোধগম্য হইল,—মাধব মন্দিরে আওব ত্বরিতে,—মাধব শীঘ্রই আগমন করিবেন। এই শুভ সংবাদদাতার নাম—'কপাল'। বৈষ্ণব সাহিত্যের এবিকৃত প্রেমচিত্র কি ইংরেজি প্রেম-কাহিনীতে পাওয়া যায়? তাহার পর——

চিকুর ফুরিছে, বসন খসিছে, পুলক যৌবন ভার।
বাম অঙ্গ আঁখি, সঘনে নাচিছে, দুলিছে হিয়ার হার॥

কেবল যে 'কপাল' বলিয়া গেল, মাধব আসিতেছেন তাহা নহে; রাধিকা আরো উৎকৃষ্টতর প্রমাণ পাইয়াছেন। তাঁহার

এক প্রমাণ,—অপূর্ব্ব আনন্দভরে 'চিকুর ফুরিছে', অঙ্গের বসন খসিয়া পড়িতেছে ; আর—আর যে নবযৌবন এতদিন তাঁহাকে দেহের ভারের ন্যায় পীড়িত করিতেছিল, আজ সেই নবযৌবন পুলকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। ইহা কি উৎকৃষ্টতর প্রমাণ নহে যে, মাধব আসিতেছেন ? ইহাই শেষ প্রমাণ নহে, আরো প্রমাণ আছে ; আজ রাধিকার বাম আঁখি ঘন ঘন নাচিতেছে এবং তাঁহার বক্ষ বিলম্বিত হার স্পন্দিত হইতেছে। ইহাতেও কি বুঝা যায়না যে, কৃষ্ণ আসিতেছেন ?

প্রভাত সময়ে, কাক কোলাহলি, (১) আহার বাটিয়া খায়।
পিয়া আসিবার, নাম শুধাইতে, উড়িয়া বসিল তায়॥

অন্যান্য দিন প্রভাত সময়ে যখন কাককুল কোলাহল করিয়া আহার বাটিয়া খাইত, তখন যদি রাধিকা উহাদের পাশে যাইয়া কৃষ্ণের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেন, তবে উহারা উড়িয়া পলায়ন করিত, আজ কিন্তু উহারাও বিপরীতাচারণ করিতেছে। আজ কৃষ্ণের সংবাদ জানিবার জন্য উহাদিগের নিকট গেলে, আর উহারা উড়িয়া পলাইল না। ইহাতেও কি জানা যায়না যে, শ্রীকৃষ্ণ আজ শ্রীবৃন্দাবনে আসিতেছেন ? যদি ইহাতেও তুমি সন্তুষ্ট না হও, তবে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও শেষ প্রমাণ দেখ,—

মুখের তাম্বুল, খসিয়া পড়িছে, দেবের মাথার ফুল।
কহে চণ্ডীদাস, সব সুলক্ষণ, বিহি ভেল অনুকূল॥

---

(১) বিদ্যাপতিও এইরূপ অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন —

সোহি কোকিল, অবলাখ ডাক ডাকুউ, লাখ উদয় করু চন্দ।
পাঁচবাণ অব লাখবাণ হউ, মলয় পবন বহু মন্দ॥

আজ হর্ষভরে মুখের তাম্বুল ও দেবের মাথার ফুল মাটিতে পড়িতেছে,—ইহাতো রাধিকার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ। ইহাতেই রাধিকা বুঝিলেন, মাধব বৃন্দাবনে আসিতেছেন।

"আমার নিকট চণ্ডীদাসের পদটী এক অভিনব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত বলিয়া বোধ হইয়াছিল। মনে হইয়াছিল, যেন কত দুঃখ ও যন্ত্রনার জন্য জীবের সংসারে আসা,—এই জীবন পঙ্ক-দিগ্ধ কমলদলের ন্যায় অবস্থার বিড়ম্বনায় কলুষিত। সহায় প্রার্থনা করিয়া অনির্দ্দেশে যাঁহার নিকট সান্ত্বনার জন্য উপস্থিত হইতে চাই, তিনি দূর হইতেও দূরে, বাক্য মনের অগোচর। নিরাশায় কতবার নিতান্ত দুর্ব্বল ও অনাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছি, সজল চক্ষে কাহার পানে তাকাইয়াছি, তিনিত অশ্রুধারা মুছাইয়া দেন নাই,—'দেহি সংসার মোক্ষংমে' বলিয়া যাহাকে আশ্রয় স্বরূপ বরণ করিতে গিয়াছি, মনে হইয়াছে যেন সে অবলম্বন মরিচীকা বালুর স্তম্ভ, ছুঁইতে গেলে ভাঙ্গিয়া যায়, অনির্দ্দেশে কাহাকে খুঁজিয়া মরিয়াছি, ক্ষণে ক্ষণে অবিশ্বাসের ছায়ায় চিত্ত আঁধার হইয়া গিয়াছে, তিনি আসেন নাই। কিন্তু মুমূর্ষ শয্যায় 'কুদিন সুদিন ভেল', মৃত্যুর দিন সমস্ত পার্থিব বন্ধন কাটিয়া যাইতেছে, আজ চক্ষের স্বপ্ন ঘোর চলিয়া যাইতেছে—যেন কোন অপূর্ব্ব আলোকময় মহাশ্রয়ভূত সুহৃদুত্তমের খোঁজ পাইয়া চক্ষের জলে মুখ মণ্ডল প্লাবিত হইয়া পড়িতেছে, আজ মুমুর্ষ শয্যায় বাকশরোধ হইয়াছে, কিন্তু মনে হইতেছে—শ্রবণহুঁ শ্যাম নাম করু গান। শুনইতে নিকষউ কঠিণ পরাণ।'

আজ বহির্ম্মুখী চক্ষুস্থির এবং দৃষ্টিহারা হওয়া সত্ত্বেও কোন অকারণ পুলকে স্পন্দিত হইতেছে। শেষ নিশ্বাস নিকটবর্ত্তী হওয়া সত্ত্বেও রুদ্ধ-প্রায় বক্ষ প্রদেশ কোন শুভ দেবতার সম্মিলন আশায় কম্পিত হইতেছে, হিয়ার হার দুলিয়া উঠিতেছে, যে শান্তির জন্য আত্মহারা হইয়া বুকভরা দুঃখ লইয়া কাতর ও ব্যাকুল নেত্রে নিশি দিশি খোঁজ করিতেছি—সে শান্তির নিকেতন যেন আজ অদূরে দৃষ্টি পথবর্ত্তী, পক্ষীকুল কাকলি দ্বারা সেই অনাস্বাদিত সুখের অপূর্ব্ব পূর্ব্বাভায বিজ্ঞাপন করিতেছে। আজ অদৃষ্ট আমাকে সত্য সত্যই বলিয়া গেল— 'কুদিন সুদিন ভেল'। মুমূর্ষ শয্যায় এই মহাসুখ-সম্মিলন কল্পনা করিয়া চণ্ডীদাসের এই পদটী আমার নিকট মধু হইতেও মধুতর হইয়াছে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা যে দিন শেষ মূহুর্ত্ত প্রকৃতই উপস্থিত হইবে, সে দিন যেন শুভ পূর্ব্বাভায বিজ্ঞাপী অভাবনীয় মহাসুখের প্রশ্রবন স্বরূপ এই পদের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।'* ভাবুক পাঠক একবার স্থির চিত্তে এই পদটী পাঠ করুন দেখি। চণ্ডীদাসের এপদটী আপন গৌরবেই অতুলনীয়। কবিত্ব বুঝাইবার বিষয় নহে, ভাবিবার বিষয়। যাঁহারা বৈষ্ণব-সাহিত্য আলোচনা করিবেন, তাঁহারা বৈষ্ণব কবিদিগের অতুলনীয় চিত্রে ও তাঁহাদের ধর্ম্ম শিক্ষায় অমনোযোগী হইতে কিছুতেই সক্ষম হইবেন না।

* নির্ম্মাল্য।

আমরা কালিন্দী-উপকূলে বৃন্দাবনের কবি কল্পিত দৃশ্য কখনো দর্শন করি নাই ;—'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল-গো, আকুল করিল মোর প্রাণ' বলিয়া কোনো নামের প্রভাবে আমাদের হৃদয় বিচলিত হয় নাই। আমাদের হৃদয় অন্য উপাদানে গঠিত, আমরা ইংরেজিতে শিক্ষিত, আমাদের অস্থি মজ্জাতে সাহেবিয়ানা, কাযেই আমরা বৈষ্ণব ধর্ম্মের আলোচনা করিতে গিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করি। বলি, অশ্লীলতা কি বৈষ্ণব সাহিত্যে, না আমাদের মনে? সাহিত্য-সম্রাট ৺বঙ্কিম চন্দ্র লিখিয়াছেন,—'অশ্লীলতা সকল সভ্য সমাজেই ঘৃণিত। তবে, যেমন লোকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন, তেমনি দেশ ভেদেও রুচি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। এমন অনেক কথা আছে যাহা ইংরেজেরা অশ্লীল বিবেচনা করেন, আমরা করি না ; আবার এমন অনেক কথা আছে যাহা আমরা অশ্লীল বিবেচনা করি, ইংরেজেরা করেন না। ইংরেজের কাছে প্যানটালুন বা উরুদেশের নাম অশ্লীল,—ইংরেজের মেয়ের কাছে সে নাম মুখে আনিতে নাই। আমরা ধূতি, পায়জামা বা উরু প্রভৃতি শব্দ গুলিকে অশ্লীল মনে করি না। মা, ভগিনী বা কন্যা কাহারো সম্মুখে ঐ সকল কথা ব্যবহার করিতে আমাদিগের লজ্জা নাই। পক্ষান্তরে স্ত্রী পুরুষের মুখ চুম্বনটা আমাদের সমাজে অতি অশ্লীল ব্যপার। কিন্তু ইংরেজের চক্ষে উহা অতি পবিত্র কার্য্য—মাতৃ পিতৃ সমক্ষেই উহা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। এখন আমাদের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য ক্রমে, আমরা দেশী জিনিষ সকলই

হেয় বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছি। বিলাতী জিনিষ সবই ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। শিক্ষিত বাঙ্গালী এমনও আছেন, যে তাঁহাদের পরস্ত্রীর মুখ চুম্বনে আপত্তি নাই; কিন্তু পরস্ত্রীর অনাবৃত চরণ, আলতা পরা মলপরা পা! দর্শনে বিশেষ আপত্তি। ইহাতে আমরা যে কেবলই জিতিয়াছি, এমত নহে। একটা উদাহরণ দ্বারা বুঝাই। মেঘদূতের একটী কবিতায় কালিদাস কোন পর্ব্বত শৃঙ্গকে ধরণীর স্তন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা বিলাতি রুচি বিরুদ্ধ। স্তন বিলাতি রুচি অনুসারে অশ্লীল কথা, কাযেই এই উপমাটি নব্যেরকাছে অশ্লীল। নব্যবাবু হয়ত ইহা শুনিয়া কানে আঙ্গুল দিয়া পরস্ত্রীর মুখ চুম্বন ও করস্পর্শের মহিমা কীর্ত্তনে মনোযোগ দিবেন। কিন্তু আমি ভিন্ন রকম বুঝি; আমি এই উপমার অর্থ এই বুঝি যে পৃথিবী আমাদিগের জননী, তাই তাঁকে ভক্তি ভাবে, স্নেহ করিয়া "মাতা বসুমতী" বলি; আমরা তাঁহার সন্তান; সন্তানের চক্ষে, মাতৃস্তনের অপেক্ষা সুন্দর, পবিত্র, জগতে আর কিছুই নাই—থাকিতেও পারে না। ইহাতে যে অশ্লীলতা দেখে আমার বিবেচনায় তাহার চিত্তে পাপ চিন্তা ভিন্ন কোন বিশুদ্ধ ভাবের স্থান হয় না। কবিতা এখানে অশ্লীল নহে;—এখানে পাঠকের হৃদয় নরক। এখানে ইংরেজি রুচি বিশুদ্ধ নহে—দেশী রুচিই বিশুদ্ধ।" কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য, চিরস্মরণীয়। যাহারা বঙ্কিমচন্দ্রের এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিবেন, তাহারাই যেন বৈষ্ণব সাহিত্যের মর্ম্মোদ্ঘাটনে প্রবৃত্ত হন, নতুবা বৈষ্ণব ধর্ম্মের সুগভীর মন্ত্র তাহারা কোন দিনেও জানিতে পারিবেন না।

সপ্তম প্রস্তাব।

(অন্তকাল।)



রাঢ় ও উৎকল রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী সুবিস্তৃত প্রদেশকে মল্ল ভূমি বলিত। পূর্ব্বকালে মল্লজাতি উহার অধীশ্বর ছিল। "বর্ত্তমান মানভূমি, সিংহভূমি, শিখরভূমি, শূরভূমি প্রভৃতি প্রাচীন কালে মল্লদেশের অন্তর্গত ছিল এবং মল্লগণ দ্বারা অধ্যুসিত ও শাসিত হইত। মান, সিংহ, বীর, শূর, বরা, ধল প্রভৃতি আধুনিক মল্লগণের উপাধি দেখিয়াও তাহার উপলব্ধি হয়। মেগেস্থিনিস উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন যে, সমুদ্রের উপকূলে কলীঙ্গি জাতির বাস; তদূর্দ্ধে মণ্ড ও মল্লী, যাহাদিগের গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেশে মল্লস নামক পর্ব্বত (Trag I. VI)। ইউল সাহেবের মতে মল্লস পর্ব্বত বর্ত্তমান দামোদর সন্নিকটবর্ত্তী পরেশনাথগিরি (Ind. Ant Vol Vi P. 127)। ইহা পঞ্চকোটের শৈলমালা ও সুশুনীয়ার পাহাড় হওয়া অসম্ভব নহে। পরেশ নাথ, পঞ্চকোট এবং সুশুনীয়ার বর্ত্তমান মল্লভূমির বহির্ভূত। সুতরাং মেগেস্থিনিসের সময় ভূমি প্রত্যয়ান্ত মান ভূমি, বীর ভূমি ইত্যাদি প্রদেশ সমূহ মল্লদেশের অন্তর্গত ছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।" (১)

(১) ঐতিহাসিক চিত্র।

বীরভূমের সর্ব্ব প্রথম হিন্দু নরপতি—বীর সিংহ। ইনি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। হণ্টার সাহেব বলেন যে, বীরসিংহ নিজ বাহুবলে বীরভূম বাসিদিগকে পরাজিত করিয়া নিজের শাসনাধীনে আনয়ন করেন। রাজ্য দখল করার পর তিনি নিষ্কণ্টক হইবার অভিপ্রায়ে স্বীয় ভ্রাতাকে বিতাড়িত করিয়া রাজশক্তির পরিচয় স্বরূপ 'বীরসিংহ' নগর প্রতিষ্ঠিত করেন। বীরসিংহ রাজধানীতে অভেদ্য দুর্গ, মনোরম প্রাসাদ; উপবন প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শিউড়ির তিন ক্রোশ পশ্চিমে সেই সকলের ভগ্নাবশেষ এখনো ধরণীর মূকবক্ষে পতিত থাকিয়া অতীত কীর্ত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। জীবন ও সুখ ক্ষণস্থায়ী, অধিকন্তু চির দিন সমান থাকে না। বীরসিংহ এই শাশ্বতীনীতির অনুসরণ করিয়া মোসলমান সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন এবং স্বীয় অমূল্য জীবন ডালি দিয়া রণক্ষেত্রে অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হন। তাঁহার পত্নী যবনের অপবিত্র সংস্পর্শে কলুষিত হইবার আশঙ্কায় সরোবর-নীরে আত্মবিসর্জ্জন দিয়া পতির অনুগমন করতঃ হিন্দু সতীর কর্ত্তব্যপালন করেন। এই সরোবর অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, আজিও লোক উহাকে 'রাণীদহ' বলিয়া থাকে। বীরসিংহ রাজধানীর অনতিদূরে কাননাভ্যন্তরে গোপাল নামক দেব-মূর্ত্তি এবং উক্ত বিগ্রহের চতুঃপার্শ্বে পুরাণ বর্ণিত বৃন্দাবন কুঞ্জের ন্যায় একটী কুঞ্জ রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত কুঞ্জের নাম 'বৃন্দাবন' ছিল। আজিও উহা দীন দশায় অবস্থান করিতেছে।

তৎপর চণ্ডীদাসের সময় অর্থাৎ খৃষ্টিয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বীরভূমি মগধ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

বিদ্যাপতির নান্নুর ত্যাগের পর হইতে চণ্ডীদাস জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও গিয়াছিলেন কি না তাহা জানা যায় না। শ্রীযুক্ত রমণীমোহন মল্লিক মহাশয় লিখিয়াছেন,—

'চণ্ডীদাস জীবনের শেষ দশায় শ্রীবৃন্দাবন ধামে গমন করিয়া সেখানেই সমাধিস্থ হন। আজ পর্য্যন্ত তাঁহার সমাধি শ্রীবৃন্দাবনে বিদ্যমান আছে জানিতে পারা যায়। রামমণিও ঐ পথ অনুসরণ করেন।' মল্লিক মহাশয়ের একথা কতদূর বিশ্বাস করা যায় তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। চণ্ডীদাসের পদাবলীর কোনোস্থানে তাঁহার বৃন্দাবন বাসের কথা দেখা যায় না।

ইহার পরেই রমণী বাবু লিখিয়াছেন,—

'চণ্ডীদাস নান্নুরের নিকটবর্ত্তী মতিপুরে কীর্ত্তন করিতে গিয়াছিলেন তথায় নাট-মন্দির পতিত হওয়ায় তাঁহার ও রামমণির মৃত্যু হয়। উল্লিখিত ঘটনা গুলি কিন্তু বিশ্বাস যোগ্য নহে।'

আমাদের নিকট এই ঘটনাগুলিই সত্য বলিয়া বোধ হয়। চণ্ডীদাস বৃন্দাবনে দেহ ত্যাগ করেন, শুনিতে পাইয়া রমণী বাবু তাঁহাকে বৃন্দাবনে সমাধিস্থ করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস চণ্ডীদাস পূর্ব্বোল্লিখিত রাজা বীরসিংহ স্থাপিত 'বৃন্দাবনে' সমাধি মগ্ন হন। বীরভূম জেলার কীর্ণাহার হইতে প্রকাশিত 'বীরভূমি' পত্রিকায় প্রকাশ যে, 'বীরভূমি' কার্য্যালয়ের অনতি দূরে একটী প্রকাণ্ড ইষ্টক স্তূপ আছে। তাহার শিরোদেশে নানা

জাতীয় বৃক্ষলতা অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। স্তূপের পাদদেশে একটী বৈরাগীর আশ্রম। প্রবাদ এই যে, চণ্ডীদাস গান করিতে করিতে মন্দির পতনে ঐস্থানেই সমাহিত হন। লোকে ঐ আশ্রমকে 'চণ্ডীদাসের আখড়া' বলিয়া থাকে। মূলে কিছু সত্য নিহিত আছে, কেন না "নহ্য মূলা জন শ্রুতি"।

চণ্ডীদাস সম্বন্ধে কবি গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন,—

চণ্ডীদাস চরণ, চিন্তামণিগণ, শিরে করি ভূষা।
শরণাগত জনে, দীন আকিঞ্চনে, করুণা করি পুরব আশা॥
হরি হরি তব মঝু আকুশল যাব।
রসিক মুকুটমণি, প্রেম-ধনেহি ধনা, কৃপা নিরমিল যব পাব॥ ধ্রু।
হৃদয় শুধি মোহে, ঐছে প্রবোধিব, যৈছে ঘুচয়ে আঁধিয়ার।
শ্যামের গোরি, বিলাস রস কিঞ্চিত, মঝু চিতে করু পরচার॥
দুহুঁক চরিত, বদন ভরি গাওব, রসিক ভকতগণ পাশ।
ক্ষম অপরাধ, সাধ মঝু পূরহ, কহে দীন গোবিন্দ দাস॥

চণ্ডীদাসের আদর যে এই কালে হইয়াছে, তাহা নহে তৎকালেও তিনি যশঃ সম্মানে মণ্ডিত হইয়াছিলেন এবং তিনি যে কেবল কবিতাই লিখিতেন তাহা নহে, তিনি গদ্যেও পুস্তকাদি লিখিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার কোন গদ্য পুস্তক আমাদের দৃষ্টির অধিকারে আসে নাই।

জয়দেব কবি নৃপতি শিরোমণি বিদ্যাপতি রসধাম।
জয় জয় চণ্ডীদাস রসশেখর অখিল ভুবনে অনুপাম॥
যা কর রচিত মধুর রস নিরমল গদ্য পদ্যময় গীত।
প্রভু মোর গৌরচন্দ্র আস্বাদিলা রায় স্বরূপ সহিত॥

বৈষ্ণব দাস।

ইহাতে জানা যায় চণ্ডীদাস গদ্য পদ্যময় গীত রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু গদ্য পদ্যময় গীত কিরূপ তাহা বুঝিতে পারা যায় না। ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন, 'বৈষ্ণবদাসের ও লেখার উপর আস্থা স্থাপন করা যায়না। বিশেষতঃ ইহা এক সাধারণ নিয়ম বলিয়া বোধ হয় যে, সকল দেশেই গদ্যের পূর্ব্বে পদ্যই প্রথম রচিত হয়। গ্রীস্‌দেশে লিনস্‌ আকিয়স্‌, মিউজিয়ম্‌ হোমর, এবং ইটালী অর্থাৎ রোমে লিবিয়স্‌ প্রভৃতি কবিগণ সর্ব্বপ্রথমে পদ্যেই রচনা করিয়াছিলেন। সংস্কৃতেও বেদ,* সংহিতা, রামায়ণ প্রভৃতি পদ্য গ্রন্থেরই প্রথম সৃষ্টি হয় অতএব বাঙ্গালাতে যে, সে নিয়মের ব্যভিচার হইবে, তাহার কোন কারণ নাই। পদ্যের মধ্যেও গীতই প্রথমে রচিত হয়। লোকে চিত্ত বিনোদনার্থ স্বরসংযোগে গান গাইতে প্রবৃত্ত হইয়াই কবিত্ব শক্তির প্রথম অঙ্কুর রোপন করে। এই সকল গান প্রথমতঃ লিপিবদ্ধ থাকে না—বহুকাল পর্য্যন্ত জনগণের রসনাগ্রেই থাকে। পরে ক্রমশঃ লিপিবদ্ধ হইতে আরম্ভ হয়। পূর্ব্বোক্ত লিনস্‌ হোমারাদির রচনা এবং বেদ রামায়ণাদি সকলই ঐরূপ গীতময়। অতএব বাঙ্গালারও আদ্যকালে পূর্ব্বোক্ত কবি দ্বয়ের অথবা তাদৃশ অন্য কোন কবির গীতময় রচনাই যে, প্রথমে প্রকাশিত হইবে, তাহাই সম্ভবপর বোধ হয়।'

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মত সমীচীন বলিয়াই মনে হয়। বঙ্গ-সাহিত্যের প্রথমাবস্থায় কাব্যেরই প্রাদুর্ভাব ছিল। তত শৈশবে গদ্য রচনা সম্ভবপর নহে। বৈষ্ণবদাস অতিরিক্ত মাত্রায় স্তুতি করিতে গিয়া ঐরূপ প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

---

* 'বেদকে আপাততঃ গদ্য বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। উহাতে এক প্রকার ছন্দ আছে এবং উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত নামক তিন স্বরের দ্বারা উহা উচ্চারিত হয়, অতএব উহাও পদ্য ও গীত গ্রন্থ মধ্যে পরিগণিত।'—বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য।

যাহা হউক চণ্ডীদাস গীত রচনা করিয়া যে, কেবল স্বগ্রামবাসীগণেরই কর্ণের তৃপ্তি সাধন করিতেন তাহা নহে, তিনি সখের পালা বাঁধিয়া স্থানে স্থানে গান গাহিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার স্বর যে সুমিষ্ট ছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। রামমণিও তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন, তিনিও সঙ্গীত বিদ্যায় অপটু ছিলেন না। রামমণি নিজে সঙ্গীত রচনা করিতে ও গাহিতে পারিতেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে রামমণির রচিত একটী পদোদ্ধৃত করিয়াছি।

চণ্ডীদাসই যে সর্ব্ব প্রথম সখের দলবাঁধিয়া গান গাহিয়া বেড়াইতেন, এরূপ অনুমান করা নিরাপদ নহে। তিনি রাধাকৃষ্ণলীলার আদি প্রণেতা হইতে পারেন কিন্তু তাই বলিয়া তিনি প্রথম গায়ক কিম্বা সঙ্গীতের সৃষ্টি কর্ত্তা নহেন। তাঁহার পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে বঙ্গ ভাষায় না হউক, দেব ভাষায় সঙ্গীতের প্রচলন ছিল, যথা সামবেদ। এবং বর্ত্তমান সময়ে হারমণি, কাউণ্টারপইণ্ট প্রভৃতি যে সকল বিচিত্র ব্যাপার সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাও প্রকার ভেদে বিদ্যমান ছিল।

'It is true that Hindu music abounds in melody but it is not void of harmony. The following quotation from Narada's work will best explain our meaning'

গানস্য দশবিধগুণ বৃত্তি স্তদ্ যথা, রক্তং
পূর্ণ মলঙ্কৃতং প্রসন্নং ব্যক্তং বিক্রুষ্টং শ্লক্ষ্ণং সমং
সুকুমারং মধুরমিতি গুণাঃ। তত্র রক্তং নাম
বেণুবীণাদি স্বরানামেকীভাব রক্ত মিত্যুচ্যতে।

But of all o' them are not to our present purpose : ঐক্যতান only serves our purpose well, and its defination is as follows: ঐক্যতান is that which is produced by a combination of the sounds of all stringed instruments, wind instruments, and those of other kinds —This is harmony.' (১)

এদেশী সঙ্গীতের উৎপত্তির কারণ ও সৃষ্টিকর্তার অনুসন্ধান করিতে যাওয়া নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। পুরাণাদি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, দেবাদিদেব মহাদেব সর্ব্ব প্রথম সঙ্গীত সৃষ্টি করিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মাকে শিক্ষা দেন। তিনি আবার নারদ ঋষিকে শিখান, এইরূপে ক্রমে ক্রমে সঙ্গীতের প্রচলন হয়। পুরাণের সকল কথা বিশ্বাস করিতে হইলে, একথাও বিশ্বাস না করিয়া গত্যন্তর নাই। কিন্তু মহাদেব সৃষ্টিকর্ত্তা হইলেও, তিনি কিম্বা তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্য দ্বারা তাহার উৎকর্ষতা সংশোধিত হয় নাই। মোগলমান নরপতিগণের সময়েই সঙ্গীত পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

চণ্ডীদাসের পূর্ব্বে মার্জ্জিত ভাষায় রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক সংগীতাদি না থাকিলেও, আমাদের দেশের নিরক্ষর কৃষক গণ ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে যাইবার সময় স্কন্ধদেশে হল লইয়া ও এক হস্ত দ্বারা বলবর্দ্দীর লাঙ্গুল ধৃত করিয়া মনের আনন্দে গ্রাম্যসঙ্গীতাদি গাইতে গাহিতে যাইত এবং চাঁদনী রাত্রিতে স্রোতস্বিনীবক্ষে তরণী ভাসাইয়া মাঝিগণ যে আনন্দ উপভোগ

(১) সঙ্গীতদর্পন and অদ্ভুত রামায়ণ। (vide Hindu Patriot, 7th Sep 1894—Quoted by Naba Prava).

করিতে পশ্চাৎপদ ছিল না। এই সকল সঙ্গীতই বাংলার আদি সঙ্গীত। ইহাতে ভিন্ন সমাজের আচার ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়।

'I think most Europeans who take the whole trouble to compare them (i. e boatman's songs) with the best specimens in Sangit Sara (সঙ্গীত সার) etc will readily credit my Statement in my letter of 17th May 1875 (addressed to the director of Public Intruction) viz, that while all Hindu musicians speak with contempt and almost abhorrance of the boatman's songs. I have heard many Europeans declare that *the boatman's chants are the only music in Bengal that can properly be called music.*' (২)

যাহা হোক এখন ছন্দ ও ভাষা সম্বন্ধে দুই একটী কথা লিখিয়া, এই প্রস্তাব শেষ করি।

চণ্ডীদাস কেবল পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তিনি অক্ষর গুণিয়া কবিতা রচনা করেন নাই বা মিলের দিকেও দৃষ্টি রাখেন নাই! স্বরের মিষ্টতার জন্য তিনি আবশ্যক মত পদ দীর্ঘ বা হ্রস্ব করিয়াছেন এবং সুবিধা জনক স্থানে যতি দিয়াছেন। চণ্ডীদাস অনেকটা জয়দেবের অনুকরণে পয়ার ও ত্রিপদী লিখিয়াছেন।

ত্রিপদী সংস্কৃত কথা, উহার তিনটী করিয়া পদ থাকে। "পয়ার এই শব্দটী কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়রূপে বলিতে পারা

(২) Calcutta Review—Mr. C. B. Clarke, Quoted by Nabaprava.

যায় না, কিন্তু বোধ হয় 'পাদ' শব্দের অপভ্রংশে পায়া বা পয়া শব্দ উৎপন্ন হয়,—যথা সেপায়া, খাটেরপায়া ইত্যাদি। ঐ পায়া হইতেই পয়ার শব্দ সঙ্কলিত হইয়াছে, অতএব পয়ার শব্দের অক্ষরার্থ পাদ (চরণ) বিশিষ্ট। ক্রমশঃ উহা নির্দ্দিষ্টরূপে ছন্দোবোধার্থ যোগরূঢ় হইয়া উঠিয়াছে।' (৩)

চণ্ডীদাস খুব সম্ভবতঃ ১৩০৮-১৫শকের মধ্যে পরলোক গমন করেন। লোকে বীরভূমেরকীর্ণ হারের নিকট তাঁহার সমাধি নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

চণ্ডীদাসের কবিত্ব অতুলনীয় ছিল। কবি প্রসাদ দাস লিখিয়াছেন,—

কিবা অপরূপ, কবিতা মাধুরী, আখর পিরীতি মাখা।
আময়া ছানিয়া, দিলা বিতারিয়া, অনুপ বচন ভাখা॥
বরজ যুগল, পিরীতির খনি, সে মুখ শরদ শশি।
কবিতা পঠনে, হেন লয় মনে, চিত যায় যেন খসি॥
বাশুলী আদেশে, যুগল পিরীতি, গাইলা সে কবি চন্দ।
রস কবিকুল, মত্ত মধুকর, পিয়ে ঘন মকরন্দ॥
নিতাই আদেশে, পরসাদ দাসে, গাইবে ব্রজ বিলাস।
চরণ সরোজে, শরণ লইনু, সফল করহ আশ॥

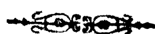
কবি কানুদাস লিখিয়াছেন,—

কবিকূলে রবি, চণ্ডীদাস কবি, ভাবুকে ভাবুক মণি।
রসিকে রসিক, প্রেমিকে প্রেমিক, সাধকে সাধক গণি॥
উজ্জ্বল কবিত্ব, ভাষার লালিত্য, ভুবনে নাহিক হেন।
হৃদে ভাব উঠে, মুখে ভাষা ফুটে, উভয় অধীন যেন॥
সরল তরল, রচনা প্রাঞ্জল, প্রসাদ গুণেতে ভরা।
যেই পশে কাণে সেই লাগে প্রাণে, শুনামাত্র আত্মহারা॥
রামতারা ধনী, রাধা স্বরূপিনী, ইষ্টবস্তু যাঁর হয়।
যাঁহার দরশে, চণ্ডী রসে ভাসে, কবিতার স্রোত বয়॥
হয় নাই কেন, না হইবে পুনঃ, হেন রসপদ ভবে।
দীন কানুদাসে, রাখ পদ পাশে, নামের ঘোষণা রবে॥

(৩) বাঙ্গলা সাহিত্য।

অষ্টম প্রস্তাব।

(নানাকথা ।)



১৩০৯ সালের শ্রাবণ মাসের 'বীরভূমি' পত্রিকায় 'চণ্ডীদাসের জন্মস্থান কোথায় ছিল?' বলিয়া একটী ক্ষুদ্র মন্তব্য প্রকাশিত হয়। তাহাতে লিখিত ছিল,——

"সকলেই জানেন, চণ্ডীদাস বীরভূম জেলার অন্তর্গত নান্নুর গ্রামে বাস করিতেন। নান্নুর যে তাঁহার বাসস্থান, এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ হইতে পারে না, ইহা তাঁহার পদ হইতেই প্রমাণ হইতেছে। তবে নান্নুর যে তাঁহার জন্মস্থান ছিল, একথাও কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না। কেন না, একথার কোন বিশিষ্ট প্রমাণ নাই। চণ্ডীদাসের জ্ঞাতি কি কুটুম্ব কেহ নান্নুরে নাই। চণ্ডীদাস কোন্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। এরূপ অবস্থায় তাঁহার জন্মস্থান সম্বন্ধে যদি কোন কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সহজেই তাহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। একজন মিথিলা দেশবাসী পণ্ডিত মধ্যে মধ্যে কীর্ণহারে আসিয়া থাকেন। তিনি বলেন, চণ্ডীদাস মিথিলাবাসী ছিলেন। মজঃফরপুর জেলায় উচৈচেট্ গ্রাম তাঁহার জন্মস্থান ছিল। তথায় তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ এখনও রহিয়াছে। তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুপণ্ডিত ছিলেন। চণ্ডীদাস কিন্তু মূর্খ ছিলেন। এই জন্য তিনি সময়ে সময়ে লাঞ্ছিত হইতেন। একদিন অতিমাত্রায় লাঞ্ছিত হওয়ায় তিনি সরস্বতীর আরাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। ক্রমে চণ্ডীদাস অসাধারণ পণ্ডিত হয়েন। কিছু দিন পরে তিনি পুরুষোত্তম যাত্রা করেন। আর দেশে ফিরিলেন না। মিথিলার বর্ত্তমান লোকে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত জানে।

তাহার পর তিনি যে মধুর সঙ্গীতে বঙ্গদেশ মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা তাহারা জানে না। তাহারা না জানুক, তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ যে জানিতেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। না জানিলে চণ্ডীদাসের স্মৃতি মিথিলা হইতে বিলুপ্ত হইত। পাণ্ডিত্যে লোক অমর হয় না, কবিত্বে হয়।

তবে এক কথা এই উঠিতে পারে, চণ্ডীদাস যদি মিথিলাবাসী হইলেন, তবে তাঁহার পদাবলী বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় রচিত কেন? একথার সহজ উত্তর এই চণ্ডীদাস বহু দিন এদেশে থাকিয়া বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি যে বাঙ্গালীর বোধগম্য ভাষায় কবিতা রচনা করিবেন, ইহা স্বাভাবিক।

আমরা আজ এই পর্য্যন্ত লিখিয়া নিরস্ত হইলাম। যখন কথাটা উঠিল, তখন সুধীগণের কর্ত্তব্য ইহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করা।"

ইহার পর আর দুই এক সংখ্যার বীরভূমি আমার হস্তগত হইয়াছে তাহার পর আর হয় নাই, সম্ভবতঃ পত্রিকা খানি উঠিয়া গিয়াছে, কাযেই চণ্ডীদাস সম্বন্ধে আর কোনো কথা উহাতে আলোচিত হয় নাই।

পূর্ব্বোক্ত মিথিলা-পণ্ডিতের এই উক্তি বিশ্বাস করিতে হইলে সর্ব্ব প্রথম আমাদিগকে উচেট্ গ্রামে যাইতে হয় কিন্তু তথায় যাইয়াও বিশেষ কোনো ফল হয় নাই। তদ্দেশ-বাসীগণ চণ্ডীদাস নামধেয় এক কবিকে তাহাদের দেশে টানিয়া আনে বটে কিন্তু নানুরের কবিই যে সেই, তাহা তাহারা সাহস করিয়া বলিতে পারে না। সুতরাং আমরা চণ্ডীদাসকে মিথিলা বাসী বলিয়া স্বীকার করিতে সম্পূর্ণ নারাজ।

মিথিলা বাসী কেহ কেহ যে চণ্ডীদাসকে তাহাদের স্বজাতীয় ও স্বদেশীয় কবি বলিয়া প্রকাশ করেন তাহার কারণ, চণ্ডীদাসের

অলৌকিক কবিত্ব-গৌরব। চণ্ডীদাসের ন্যায় কবি যে দেশে ও যে জাতিতে আবির্ভূত হন, সে দেশ ও সে জাতি ধন্য। বাঙালীর গৌরব করিবার কি আছে? আছে কেবল 'কবিরাজ-রাজি মুকুটালংকার হীরক স্বরূপ' কয়জন বৈষ্ণব গীতি কাব্যকার। ইঁহাদিগকে বঙ্গবাসী কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারে না, ইঁহারা তাহাদের হৃদয় আঁকড়াইয়া বসিয়া আছে।

জয়দেবের পূর্ব্ব হইতে বঙ্গ দেশে যে বিশ্ব-জননী প্রেম ও ভ্রাতৃভাবের অঙ্কুর হইয়াছিল, নিমাই চাঁদের সময় তাহাই দেশময় ছড়াইয়া পড়ে। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের বহু দিন পূর্ব্ব হইতে বঙ্গবাসীর হৃদয়-কন্দরে বৈষ্ণবীয় প্রেম ও ভক্তি সঞ্জাত হইয়াছিল, রাধা কৃষ্ণ লীলা গীতিতে গৌড় জনের চিত্ত-ক্ষেত্র কৃষ্ণ-প্রেম বারিতে অভিষিক্ত হইয়াছিল। চণ্ডীদাস সেই মধুর লীলা স্তরভেদে বর্ণন করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা সেই স্তরের প্রকার ভেদ বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা পাইব।

চণ্ডীদাসের পদাবলী নিম্ন লিখিত রূপে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(১) ভাব ;—সংস্কৃত সাহিত্যে ভাবের অর্থ এইরূপ করা হইয়াছে।

শুদ্ধ সত্ত্ব বিশেষাত্মা প্রেম সূর্য্যাংশু সাম্যভাক্।
রুচি ভিশ্চিত্ত মাসৃণ্য হৃদসৌভাব উচ্যতে॥

প্রেম সূর্য্যের রশ্মি রূপ শুদ্ধ স্বত্ব বিশেষের সার যাহার স্বরূপ, রুচি এবং সৌহার্দ্দ দ্বারা চিত্তের প্রশান্ততা সম্পাদক যে ভাব বা ভক্তি তাহাকেই ভাব বলা যায় ‡ যথা,——

আজু কে গো মুরলী বাজায় ।
এত কভু নহে শ্যাম রায় ॥
ইহার গৌর বরণে করে আলা ।
চূড়াটী বাঁধিয়া কেবা দিলা ॥ ইত্যাদি । (চণ্ডীদাস ॥)

(২) রাগ ;——

দুঃখ মপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈবরজ্যতে ।
যতস্তুপ্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্যতে ॥

যে প্রণয়ের উৎকর্ষ হেতু সমধিক দুঃখ যাহা চিত্তে সুখ উৎপাদন করে তাহাকে রাগ কহে । ‡

বৈষ্ণব সাহিত্যে পূর্ব্ব রাগেরই আধিক্য । উহা আবার দুই প্রকার,--নায়িকার পূর্ব্বরাগ ও নায়কের পূর্ব্বরাগ । কৃষ্ণের গুণ শ্রবণ করিয়া মিলনের পূর্ব্বে রাধিকার হৃদয়ে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল. তাহাকে নায়িকার পূর্ব্বরাগ বলে এবং এই প্রকারে কৃষ্ণের হৃদয়ে যে ভাবের উৎপত্তি হইয়াছিল তাহাকে নায়কের পূর্ব্বরাগ বলে ।

সঙ্গমের পূর্ব্বে যেই দেখিয়া শুনিয়া ।
জনয়ে রাগ লোভ হৃদয়ে পশিয়া ॥
সেই পূর্ব্ব রাগ × × ×

ভক্তমাল ।

‡ মৎসম্পাদিত শ্রীশ্রীঅদ্বৈত মঙ্গল ।

'সই কে বা শুনাইল শ্যাম নাম'—নায়িকার পূর্ব্বরাগ এবং

শির বিজুরি, বদন গৌরী, পেখনু ঘাটের কূলে।
কানড়া ছাঁদে, কবরী বান্ধে, নব মল্লিকার মালে॥
সই মরম কহিনু তোরে।

ইত্যাদি নায়কের পূর্ব্বরাগ।

(৩) অনুরাগ ;——

সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ং।
রাগোভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে॥

যে রাগ বর্দ্ধিত হইয়া প্রিয় বস্তুকে নিত্য নূতনভাবে অনুভব করায় তাহাকে অনুরাগ বলে।

অনুরাগও নায়ক নায়িকা ভেদে দ্বিবিধ। নায়িকা কখনো সখী সম্বোধনে অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন, কখনো আত্মপ্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন।

সুখের লাগিয়া, এ ঘর বাঁধিনু, আগুণে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে, সিনান করিতে, সকলি গরল ভেল॥
সখি! কি মোর কপালে লেখি॥ ইত্যাদি

সখী সম্বোধনে নায়িকার পূর্ব্বরাগ এবং

কালিয়া কালিয়া, বলিয়া বলিয়া, জনম বিফল পাইনু।
হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়নি, মনের অনলে মৈনু॥

ইত্যাদি পদে আত্মপ্রতি অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে।

(৪) প্রেমবৈচিত্ত্য ;——

সর্ব্বথা ধ্বংস রহিতং সত্যপি ধ্বংস কারণে।
যদ্ভাব বন্ধনংযূনোঃ সপ্রেমপরিকীর্ত্তিতঃ॥

যাহার ধ্বংসের কারণ থাকিলেও ধ্বংস হয় না, এইরূপ ভাববন্ধনকে প্রেম বলে।

প্রিয়ার নিকটে বাস প্রেমময়ী ধনী।
প্রেমের বিহ্বলে প্রিয় কোথা মনে গণি॥
চৌদিকে নেহারি কান্দে বিরহ হুতাশে।
প্রেম বৈচিত্ত ইহ হেরি হরি হাসে॥ ভক্তমাল।

প্রিয়তমের নিকটে বসিয়া ধনী প্রেম-বিহ্বলা হইয়া প্রিয়তমকে দেখিতে পায় না এবং বিরহ অনুভব করিয়া চারিদিকে ছল্ ছল্ দৃষ্টিতে চায়, এই ভাবকে প্রেম-বৈচিত্ত কহে। যথা—

সুখের লাগিয়া, পিরীতি করিনু, শ্যাম বন্ধুয়ার সনে।
পরিণামে এত, দুঃখ হবে বলে, কোন্ অভাগিনী জানে॥
সই পিরীতি বিষম মানি। ইত্যাদি। (চণ্ডীদাস)

(৫) বাসক সজ্জা ;—

প্রিয়ার সহিত বিলাসের আশা করি।
গৃহশয্যা মাল্য তাম্বুল সুগন্ধ বারি॥
চন্দনাদি মালা গন্ধ বসন ভূষণ।
সাজায় করিয়া সাধ প্রিয়ার কারণ॥ ভক্তমাল।

প্রিয়তমের সহিত বিলাসের নিমিত্ত মিলনের পূর্ব্বে শয্যা মাল্য. তাম্বুল প্রভৃতি সজ্জিত করিয়া রাখাকে বাসক সজ্জা বলে। যথা,—

রাধিকা আদেশে, মনের হরষে, কুসুম রচনা করে।
মল্লিকা মালতী, আর জাতি যূথি, সাজাইছে থরে থরে॥
আজ রচয়ে বাসক শেজ। (চণ্ডীদাস।)

(৬) বিপ্রলব্ধা ;—

সখীর আশ্বাসে ধনী স্থির করি মন।
প্রিয় আগমন পথ কার নিরীক্ষণ॥

বৃক্ষের পত্রে পত্রে যদি শব্দ হয়।
এত আইসে প্রিয় বলি উঠিয়া বৈঠয়॥
দূতী পাঠাইয়া দিলা প্রিয়ার কারণে।
ফিরিয়া আইলা দূতী বজ্র হেন মানে॥
এইরূপ বিচ্ছেদ বিষাদে নিশি যায়।
*　　*　　*　ভক্তমাল।

প্রিয়তমের আগমন পথ চাহিয়া আছেন, কৈ তিনিত আসিতেছেন না? একটু বায়ু বহিলে, একটু পত্রের শন্ শন্ শব্দ হইলে ভাবেন, ঐ বুঝি তিনি আসিতেছেন? কিন্তু বৃথা আশা! প্রিয়তমের অনুসন্ধানের নিমিত্ত সখী পাঠাইলেন, সেও বিফল মনোরথ হইয়া প্রত্যাবৃত্তা হইল। বিরহের এই অবস্থাকে বিপ্রলব্ধা বলে। যথা,—

দুকান পাতিয়া, ছিল এতক্ষণ, বঁধু পথ পানে চাই।
পরভাত নিশি, দেখিয়া অমনি, চমকি উঠিল রাই॥
পাতায় পাতায়, পড়িছে শিশির, সখীরে কহিছে ধনী।
বাহির হইয়া, দেখলো সজনি, বঁধুর শবদ শুনি॥
পুন কহে রাই, না আসিল বঁধু, মরমে রহল ব্যথা।
কি বুদ্ধি করিব, পাষাণে ধরিয়া, ভাঙ্গিব আপন মাথা॥

(চণ্ডীদাস।)

(৭) খণ্ডিতা;—

অন্য নায়িকা ভোগ করিয়া নায়ক।
আইসে অঙ্গেতে নখ চিহ্নাদি যাবক॥
দেখিয়া কুপিত মনে ভর্ৎসনাদি করি।
উপেক্ষা করয়ে খণ্ডিতা বর্ণিতা নারী॥　ভক্তমাল।

নায়ক অন্য নায়িকার সহিত বিহার করিয়া অঙ্গে খত চিহ্নাদি লইয়া উপস্থিত হইলে নায়িকা খণ্ডিতা ভাবে নায়ককে উপেক্ষা ও ভর্ৎসনা করিয়া থাকে। যথা.—

ছুঁইও না ছুঁইও না বন্ধু ঐখানে থাক।
মুকুর লইয়া চাঁদমুখ খান দেখ॥
নয়ানের কাজর, বয়ানে লেগেছে, কালর উপরে কাল!
প্রভাতে উঠিয়া, ও মুখ দেখিলাম, দিন যাবে আজ ভাল!!

(৮) কলহান্তরিতা ;—

মান অন্তে প্রিয়ের বিচ্ছেদে যে সূচন।
অনুতাপে সেই কলহান্তরিতার লক্ষণ॥

মানভরে প্রিয়তমাকে তাড়াইয়া পশ্চাৎ অনুতপ্ত হওয়া ও সখীকে তিরস্কার করাকে কলহান্তরিতা কহে। যথা,—

আসিয়া নাগর, সমুখে দাড়াইল, গলে পীতবাস লৈয়া।
সো চান্দ বদনে, ফিরি না চাহলি, তো বড় নিঠুর মায়া॥
সো শ্যাম নাগর, জগত দুর্লভ, কিসের অভাব তার।
তোমা হেন কত, কুলবতী সতী, দাসী হইয়াছে যার॥
(চণ্ডীদাস।)

(৯) প্রবাস ;—

প্রেয়সী ছাড়িয়া প্রিয় দূর দেশে যায়।
তাহাকেই রীত এই প্রবাস কহয়॥ (ভক্তমাল।)

প্রিয়তমাকে ত্যাগ করিয়া প্রিয়তমের দূর দেশে যাওয়াকে প্রবাস বলে। যথা, কৃষ্ণের মথুরা ও দ্বারকা বাস। রাধিকার তৎকালীন অবস্থা ভাবিয়া কবি অনেকগুলি পদ রচনা করিয়াছেন। একটীর কিয়দংশ,—

সখিরে, বরষ বহিয়া গেল, বসন্ত আওল, ফুটল মাধবী লতা।
কুহু কুহু করি, কোকিল কুহরে, গুঞ্জরে ভ্রমরী যতা॥

আমার মাথার কেশ, সুচারু অঙ্গের বেশ, পিয়া যদি মথুরা রহিল।
ইহ নব যৌবন, পরশ রতন ধন, কাচের সমান ভেল॥

(১০) মাথুর ;—প্রবাসে প্রিয়তমের অনুসন্ধানকে মাথুর বলে।

হে কুবুজার বন্ধু!
পাসরেছ রাই-মুখ-ইন্দু॥
হে পাগধারী॥
পাসরেছ নবীন কিশোরী॥
রাই পাঠাল মোরে।
দাসখত দেখাবার তরে॥

শ্রীরাধিকা নায়কের অন্বেষণে সখী পাঠাইয়াছেন। সখী খুঁজিতে খুঁজিতে মথুরা যাইয়া 'কুবুজার' ঘরে নাগরকে পাইলেন। নায়ক নায়িকাকে পূর্ব্বে যে দাস খত লিখিয়া দিয়াছিলেন, সখী তাহাই দেখিতে চাহিলেন। দাস খত খানি এই,—

ইয়াদ্দিকিদ্দ, গুণ সমুদ্র শত সাধু শ্রীরাধা।
সহুদারস্থ চরিত তস্য পূর্বাহ্ন মন সাধা॥
তস্য খাতক হরিনায়ক বসত ব্রজপুরি।
কস্য করজ পত্র মিদং লিখিলাম সুকুমার॥
ইহার লভ্য পাইবা ভব্য বাঞ্ছা তিন করিয়া।
সুদ সমেত শোধ করিব সব কলিযুগ ভরিয়া॥
এই করারে রাই তোমারে খত দিলাম লিখি।
ললিতাদি মুঞ্জর সখী রহল ইহাতে সাক্ষী॥

(১১) ভাব-সম্মিলন। বহুদিনের বিচ্ছেদ পর নায়ক নায়িকার মিলনকে ভাব- সম্মিলন বলা যায়। ভাব-সম্মিলনের

পদ পূর্ব্বে আমরা অনেক গুলি উদ্ধৃত করিয়াছি, সুতরাং এখানে আর উদ্ধৃত হইল না।

(১২) রাগাত্মিক। লোভ পরবশ হইয়া ভক্তি মার্গে ভজনকে রাগমার্গ বা রাগভক্তি কহে।

ইষ্টে স্বারসিকা রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যাভবেদ্ভক্তিঃ সাত্ররাগাত্মিকা দিতা ॥

ইষ্ট বস্তুতে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতার নিমিত্ত প্রেম-মাধুর্য্যময় পিপাসাকে রাগ বলা যায়। সেই রাগযুক্ত ভক্তিকে রাগাত্মিকা ভক্তি বলে। 'রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসী জনে' এই ভক্তি ব্যতীত ব্রজ লাভ ঘটে না। 'রাগমার্গে কৃষ্ণ পাই ব্রজেন্দ্র নন্দন। রাধিকার সহ কৃষ্ণ ব্রজ আস্বাদন।' রসিক ভক্ত দিগকে 'রাগানুগ' ভক্ত ও তাঁহাদের ভজন প্রণালীকে 'রাগাত্মিক' বলে।

তৃতীয় প্রস্তাবে আমরা বহুতর রাগাত্মিক পদাবলী উদ্ধৃত করিয়াছি, বাহুল্যবোধে এখানে আর উদ্ধৃত করিলাম না।

(১৩) মান;—মান কাহাকে বলে তাহা আর বুঝাইবার প্রয়োজন নাই।—

রামা হে কি আর বলিব আন্?
তোহারি চরণে, শরণ গো হরি, অবহুঁ না মিটে মান॥
গোবর্দ্ধন গিরি, বাম করে ধরি, যে কৈল গোকুল পার।
বিরহে সে ক্ষীণ, করের কঙ্কন, মানয়ে গুরুয়া ভার॥ ইত্যাদি।

(চণ্ডীদাস।)

(১৪) সম্ভোগ-মিলন ;—বিচ্ছেদের পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রথম সম্মিলনকে সম্ভোগ মিলন বলা যায়।

পরাণ বঁধুকে, স্বপনে দেখিনু, বসিয়া শিয়র পাশে।
নাসার বেশর, পরশ করিয়া, ঈষৎ মধুর হাসে॥
পিঙল বরণ, বসন খানি, মুখানি আমার মুছে।
শিথান হইতে, মাথাটী বাহুতে, রাখিয়া শুতল কাছে॥ ইত্যাদি।

(চণ্ডীদাস।)

(১৫) দৌত্য ;—শ্রীকৃষ্ণ কখনো বিদেশিনী, কখনো দেয়াশিনী, কখনো বৈদ্য, কখনো ভিখারি প্রভৃতি সাজিয়া মানবতী রাধিকার সমীপে উপনীত হইতেন। ইহাকে দৌত্য বলে।

ধরি নাপিতানী বেশ, মহলেতে পরবেশ, সেখানেতে বসিয়াছে রাই।
হাতে দিয়া দরপনী, খোলে নখ রঞ্জনি, বোলে বৈস দেই কামাই॥ ইত্যাদি।

চণ্ডীদাসের পদাবলীতে শ্রীরাধা কৃষ্ণের এই সকল লীলা বর্ণিত আছে। এতদ্ব্যতীত কবির শ্রীকৃষ্ণের আপ্ত দূতী, রাই রাখাল, গোষ্ঠবিহার, রসোদ্গার প্রভৃতি সম্বন্ধীয় অনেক গুলি পদও আছে। ফলে চণ্ডীদাস শ্রীরাধা কৃষ্ণের যাবদীয় লীলাই সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন।

পূর্ব্বকালে বাঙ্‌লা ভাষার সহিত অনেকেই হিন্দি কথা মিশ্রিত করিতেন। বিদ্যাপতির অধিকাংশ গীতই হিন্দি ও ব্রজবুলির জন্য সাধারণ পাঠকের নিকট দুর্ব্বোধ্য ; চণ্ডীদাসও সে লোভ একবারে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহা হইলেও বিদ্যাপতির তুলনায় তাঁহার পদাবলীতে হিন্দি

ও ব্রজবুলির সংখ্যা অল্প। আবার বিদ্যাপতির দুই একটী পদে হিন্দির গন্ধও নাই, পক্ষান্তরে চণ্ডীদাসের এক আদটী পদ হিন্দিতে কটমট হইয়া আছে। এতদুভয়ের ভাষা এরূপ বিসদৃশ হইবার কারণ কি? তৎকালে যে হিন্দি মিশ্রিত ভাষা প্রচলিত ছিল তাহাই বা বিশ্বাস করা যায় কিরূপে? বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের বহু পরবর্ত্তী কবি গোবিন্দদাসের প্রায় অধিকাংশ পদেই হিন্দি মিশ্রিত ভাষা। কিন্তু তাঁহার সব গুলিই যে খাঁটি হিন্দি তাহা নহে,—ব্রজবুলিও আছে। পূর্ব্বকালের সব রচনাই রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক। ভাষায় এইরূপ ব্রজবুলি মিশ্রণের কারণ দেখা যাইতেছে যে,— 'কৃষ্ণচরিত বর্ণনে ব্রজ ভাষা মিশ্রিত রচনাই অনেকের অধিকতর প্রীতিকর হয়। বোধ হয় ব্রজ ভাষার মাধুর্য্য ইহার একমাত্র কারণ নহে, পবিত্রতা বোধও কিছু কারণ হইতে পারে। যে সকল কৃষ্ণ পরায়ণ ভক্তেরা পরম পবিত্র বোধে ব্রজের মৃত্তিকা পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের পক্ষে ব্রজের ভাষাকে এরূপ সমাদর করা অসম্ভব নহে। পূর্ব্বে গোবিন্দদাসের যে গীতটী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে ব্রজ ভাষার

কাহে পুন, গৌর কিশোর।
অবনত মাথে, লিখত মহিমণ্ডল
নয়নে গলয়ে ঘন লোর॥
কণক বরণ তনু, ঝামর ভেল জনু
জাগবে নিদ নাহি ভায়।
যোই পরশে পুন, তাক বদন ঘন
ছল ছল লোচন চায়॥
খেনে খেনে বদন, পানিতলে ধারই
ছোড়ই দীঘ নিশাস।

শব্দ অনেক আছে। গোবিন্দদাস চৈতন্যের পরবর্ত্তী লোক। তাঁহার সময়ে এবং তাঁহার পরেও জ্ঞানদাস, রাধামোহন দাস, কবিশেখর, রামানন্দ প্রভৃতি যে সকল কবিগণ সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের রচনাতেও ব্রজ ভাষার কথা অনেক আছে—কিন্তু সেই সময়েই অথবা তাহারই সন্নিকট সময়ে চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য ভাগবত, জীব গোস্বামীর করচা প্রভৃতি সঙ্গীতময় নহে, এরূপ যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহাতে ব্রজ ভাষার ভাগ অতি অল্পই দেখা যায়। সুতরাং ইহা এক প্রকার সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, বিদ্যাপতির সময়েও কৃষ্ণ বিষয়ক সঙ্গীতময় রচনাতে ব্রজ ভাষা বা হিন্দির সংস্রব যেরূপ অধিক ছিল, তৎকালের সাধারণ ভাষাতে সেরূপ সংস্রব ছিল না। যে সময়ের ভাষাতে ব্রজভাষার সংস্রব কিছু মাত্র নাই, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। সে সময়েরও ২।১ জন কবি যখন সাধ করিয়া ব্রজ ভাষা মিশ্রিত গীত লিখিয়া গিয়াছেন, তখন ওবিষয়ে আমাদের আর কিছুই বক্তব্য নাই।' (১)

ঐছন চরিতে, তারল সব নর নারী
বঞ্চিত গোবিন্দ দাস॥

(১) বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য।



নবম প্রস্তাব।

(উপসংহার।)



এখন আমার বিদায়ের পালা। এই প্রস্তাবে চণ্ডীদাসের সময়ে তদ্দেশের আচার ব্যবহার, পরিচ্ছদ অলঙ্কার প্রভৃতি সম্বন্ধে পদাবলী হইতে যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহাই সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠকগণের নিকট হইতে অবসর লইব। ভবিষ্যতে যদি তাঁহাদের সহানুভূতি লাভ করিতে পারি এবং আমার ভগ্নস্বাস্থ্য ফিরিয়া পাই, তবে আর একজন প্রাচীন বৈষ্ণব কবিকে লইয়া তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইব।

চণ্ডীদাস শ্রীরাধাভাবে তাঁহার অধিকাংশ পদ রচনা করিয়াছেন, পুরাণবর্ণিত মধুর লীলার অনুকরণে শ্রীরাধিকাকে লইয়া কান্নাকাটি করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীরাধিকা ও তাঁহার সখীগণ যে প্রকার কার্য্য করিয়াছেন, তৎকালে যে ঐরূপ ক্রিয়া কলাপ সাধারণ স্ত্রী-সমাজে প্রচলিত ছিল তাহা বিশ্বাস করা যায় না। তিনি ব্রজবধূগণকে দিয়া 'গোঠে' গরু চরাইয়াছেন। ব্রজের স্ত্রীলোক অদ্যাপি গোচারণ করিলেও বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমানের গৃহস্থ ঘরের স্ত্রীলোকগণ তদ্রূপ করে না। তৎকালে স্ত্রী পুরুষে নষ্টচাঁদ (নষ্টচন্দ্র) ও ইন্দ্রপূজা করিত। এখনো এই দুই উৎসব বীরভূম, বাঁকুড়া জেলায়

সামাজিক আচার ব্যবহার।

উৎসব।

আচরিত হয়। নষ্টচন্দ্র এদেশেও হইয়া থাকে। ইন্দ্র পূজা সম্বন্ধে চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন,—

গোকুল নগরে ইন্দ্র পূজা করে, দেখি আইল যত নারী।
নগর ভিতর মহা কলরব, নাগর হইল পসারী॥

ইন্দ্র পূজার কথা মনুসংহিতা ও বেদেও উল্লিখিত হইয়াছে।

রমণীগণের অলঙ্কার পরিচ্ছদাদি।

চণ্ডীদাস রমণীগণের পদে মল্লতাড়ল (মল, পশ্চিমদেশীয় রমণীগণ এখনো পায়ে দেয়) ও কিঙ্কিণী (ঘুঙুর), হস্তে অঙ্গদ, নাকে বেশর পরাইয়াছেন। বলয়, মঞ্জীর, কঙ্কণ প্রভৃতি আরো দুই একটী পরিচিত অলঙ্কারের নাম পাওয়া যায়। রমণীগণ বৈলান জাল দিয়া কবরীবন্ধন ও আমলকী দ্বারা মাথা ঘসিত। গিরিমাটী দ্বারা অঙ্গ লোহিত করতঃ পায়ে যাবক (আলতা) দিত, শিঁথায় সিন্দূর ও আবীর পরিত। তৎপর নীল শাড়ি পরিধান করিয়া বাহার দিত। কাঁচুলি ও পট্টবস্ত্রেরও প্রচলন ছিল।

ভাষা।

চণ্ডীদাস কতকগুলি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, যাহার সব-গুলি একালে প্রচলিত নাই। যথা,—চেট্টে নেট্টে (তরুণী বধূ; এখনো ঐদেশে প্রচলিত আছে), নাসা (নিচু জমি), কানড়া (সাপ), বড়ু, নিছনি; নিছিয়া (জলাঞ্জলী) বিহি (বিধি), নাছ; ইত্যাদি। "চণ্ডীদাসের কবিতা দেবী নানা ভূষণে ভূষিতা নহেন। হাব, ভাব ও ভঙ্গী তত নাই, রূপে চক্ষু ঝলসিয়া যায় না, কিন্তু স্বাভাবিক শোভায় শোভিতা। সেই শোভা কেবল নয়ন মোহিত করিয়া ক্ষান্ত হয় না, হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং তথায় থাকিয়া অন্তরাত্মাকে আনন্দ রসে প্লাবিত করে। তদীয় চরণবিক্ষেপ নর্ত্তকীর চরণচালনার ন্যায় তালবিশুদ্ধ নহে, কিন্তু চঞ্চলা বালিকার ন্যায় দ্রুত, লঘু, অনায়াসসাধ্য ও স্বাভাবিক। তদীয় বাক্য সুশিক্ষিতা মহিলার বাক্যের ন্যায় সংস্কৃত নহে, কিন্তু

বালিকার আধ আধ ভাষার ন্যায় হৃদয়গ্রাহী ও মধুময়। তদীয় কণ্ঠস্বর শিক্ষা সিদ্ধ নহে, কিন্তু বনচারী পীযূষ কণ্ঠ কোকিলার ন্যায় স্বাভাবিক ও শ্রুতি সুখাবহ চণ্ডীদাসের বিশেষ গুণ এই যে, তিনি যখন যে বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে এরূপ মগ্ন হইয়াছেন যে, চণ্ডীদাসকে বর্ণিত বিষয় হইতে স্বতন্ত্র করা দুষ্কর। তাঁহার রসানুভাবকতা এত বলবতী যে, ঠিক যেন তিনি ভাবে উন্মত্ত হইয়াছেন। এই গুণ থাকাতেই তিনি পাঠককে উন্মত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। বিদ্যাপতি সহস্র চেষ্টা করিয়াও আপনাকে তদীয় বর্ণিত বিষয় বা ব্যক্তি হইতে অভিন্ন রাখিতে পারেন নাই। ফলতঃ অন্যের আনন্দ উৎপাদন করা বিদ্যাপতির অভিপ্রায় ছিল, চণ্ডীদাস স্বয়ং আনন্দে মাতিয়া জগৎ মাতাইয়াছেন। বিদ্যাপতির কবিতা সমুদ্র-গর্ভ-নিহিত অমূল্য রত্ন, চণ্ডীদাসের কবিতা সরসীর উরসে ভাসমানা সৌরভময়ি-সরোজিনী-সদৃশা।"§

বিনিময়। হাট বাজারে দ্রব্য বিনিময়ে কেনা বেচা চলিত। গণ্ডা বুড়ি, কাহন সংখ্যক কড়ি দ্বারাও ক্রয় বিক্রয় হইত। ব্রজ ভূমিতে এখনো কড়ির প্রচলন আছে।

খাদ্য সামগ্রী। তৎকালে খাদ্য-সামগ্রীর একটী তালিকা আমরা দ্বিতীয় প্রস্তাবে দিয়াছি। তাহার অনেক গুলির কথা জয়ানন্দ বিরচিত শ্রীচৈতন্য মঙ্গলেও পাওয়া যায়।

যাও, চণ্ডীদাস যাও। অনন্ত প্রেমময়ের অনন্তবিস্তৃত প্রেমরাজ্যের কাব্যোদ্যানে স্বর্ণসিংহাসনে বসিয়া সুধাময় কণ্ঠে অনন্তকাল কূজন কর। তুমি এই নশ্বর জগতে যে অতুলনীয় সৌন্দর্য্য রাখিয়া গিয়াছ, তাহাতেই তুমি বঙ্গবাসীর হৃদয়ে সর্ব্বদা শুভ দেবতার ন্যায় বিরাজ করিবে। বাঙালীর যত দিন ভাব ও ভাষা থাকিবে, বাঙালী যত দিন বাঙালী বলিয়া

§ শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিনী।

পরিচয় দিবে, তত দিন তোমাকে বিস্মৃত হইতে পারিবেনা। আশীর্ব্বাদ কর, যখন মুমূর্ষ শয্যায় কণ্ঠরোধ হইবে তখন যেন মনে হয়,——

শ্রবণ হুঁ শ্যাম নাম করু গান।
শুনইতে নিকসউ কঠিন পরাণ॥



শুদ্ধি পত্র।

পত্র।	ছত্র।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৫	১	উচ্ছাস	উচ্ছ্বাস।
৯	১১	উরসে	ঔরসে।
২১	৪	এতন্তর	এতদন্তর।
২৭	১৮	উল্লঘন	উল্লঙ্ঘন।
২৯	২১	উপঢোকন	উপঢৌকন।
৩৫	৪	পারেন	পারে।
৩৫	৬	হইয়াছিল	হইয়াছিলেন
৩৭	১৭	গৌ;ড়	গৌড়।
৪০	১৬	ক্যাব্যাখ্যা	কুব্যাখ্যা।
৪০	২১	হেঁচড়া	হেঁচড়া।
৫০	১	ধণুক	ধনুক।
৫১	৩	সাধণ	সাধন।
৫৫	৪	জাতিয়	জাতীয়।
৫৬	১	যোবনে	যৌবনে।
৬৫	১৫	মানব	মানস।
৮২	২	হিদস্ত ান	হিন্দু সন্তান।
১০৪	১৪	সংঙ্গীতের	সঙ্গীতের।